চতুর্থ অধ্যায়

প্রান্তিকায়িত নারীর উপস্থাপনা, নি:স্বর নারী পরিসর : নির্বাচিত ছোটগল্পের নিবিড় পাঠ

মহাশ্বেতা দীর্ঘ দিন ধরেই 'আদিবাসী' মোড়কে বন্দী যারা তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে আসছেন। যে চেতনা এই মানুষ গুলোর কাছে আজও সুপ্ত হয়ে রয়েছে সেই অচেতন মনের বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব মহাশ্বেতা নিজেই যেন নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন। ব্যধিগ্রস্থ সময়ের রুগ্ন সমাজকে দেখাতে চেয়েছেন মনুষ্যত্বের প্রকৃত রূপকে। সেই কারণেই তিনি একের পর এক রচনা করেছেন উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প এবং বড়গল্প আর এই এক একটি রচনা নিয়ে আসে নিটোল মুক্তোর মতো স্বতন্ত্র বার্তা। যা অধিকাংশই পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের দলিল। সরকারী অবহেলা সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা কুটকৌশল গুলিকে ফালা ফালা করে এগিয়ে চলে তাঁর প্রতিবেদন। তবে তাঁর ছোটগল্পের বিশেষত্ব কাহিনিতে নেই, রয়েছে বিন্যাস ও বিশ্লেষণের মধ্যে। আর এ কারণেই মহাশ্বেতার গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে পাথেয় করে নিতে হয় তার নিজের মুখে বলা কিছু কথাকে,

> "স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারি, কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না তার বিরুদ্ধে

> নিরঞ্জন শুভ্র ও সূর্য সমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা। .....”[১]

সত্যি কথাই বলেছেন মহাশ্বেতা, কেননা তাঁর গল্পের মূল বিষয় হিসেবে বার বার উঠে আসে সেই ‘Voiceless section of Indian society’র কথা। যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবে সত্তরের দশকে মহাশ্বেতার রচিত গল্পের বিষয় বস্তু মানেই আদিবাসী সমাজ। আদিবাসী সমাজের সুখ-দু:খ, হাসিকান্না, জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের সমস্যা, উচ্চ মহাজন, জোতদার, জমিদারদের শোষণ, নির্যাতন প্রভৃতি বিষয় গুলি তাঁর সাহিত্যের মূল বিষয় হিসেবে উঠে আসে। বলতেই হয়, মহাশ্বেতা কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী নন। আবার কোন বিপ্লবী ধ্বজাধারী সৈনিকও নন। নিজের বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও চিন্তা ভাবনার গভীরতা নিয়েই তিনি বিপ্লবের ধারা অনুসরণ করেছেন। কেননা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) থেকে শুরু করে নকশাল বাড়ি আন্দোলন। ‘ঝাঁসির রানী’, সিধু-কানু, বীরসা মুন্ডা, বা নকশালবাদী আন্দোলনে যে অখ্যাত নামা যুবকেরা বুলেটের মালা বুকে নিয়ে নতুন পৃথিবী আনবার স্বপ্ন দেখেছে তাদের সমস্ত বিপ্লবের অভিযান যেন মহাশ্বেতা নিজেই নিজের বুকের গভীরে বহন করেছেন এবং ছোটগল্পে প্রকাশ করেছেন, তৈরি করেছেন নতুন ইতিহাস যার মূল উদ্দেশ্য একটাই দেশ একদিন সর্বপ্রকার শোষণ মুক্ত হবে জানবে নিজের ইতিহাসকে। এর জন্যই বোধহয় তাঁর লক্ষ্য ‘নিয়ত কাজ করে চলা’। আর এই কাজ মানেই সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁর সাহিত্যে কি থাকবে তা তিনি নিজেই বলেছেন,

> “শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকা। ‘জল’ গল্পের মাস্টার সৎবিবেকীকংগ্রেসি। ‘এম. ডবলু. বনাম লখিন্দ’ গল্পের ক্ষেত মজুর আন্দোলন, সি. পি. আই. এর ঘনিয়নের নেতৃত্ব দত্ত আন্দোলন। .....আবার‘দ্রৌপদী গল্পের নায়িকা আদিবাসী নকশাল কর্মী। মানসিকতায়এরা কোথাও এক এবং সেই একী ভবন আমার কাছে স্ব বিরোধীনয়।”[২]

আদিবাসী জীবনের সত্যিকারের রূপকার মহাশ্বেতা দেবী বাস্তব সমাজ থেকে উঠে আসা মুখ গুলিকে নানা রূপে রঙে সাজিয়ে নিয়ে বর্ণনা করেছেন। এবং তীব্র আঘাত করেছেন সমাজ ব্যবস্থাকে। এই কথাটি আমরা মহাশ্বেতার মুখ থেকেই শুনবো,

> "...'সংরক্ষণ' থেকে 'স্তনদায়িনী; প্রত্যেকটিতে আমি যা ঘটেআসছে, ভয়ঙ্কর একই রকম ভাবে, প্রাচীন দিন থেকে আজএবং আগামী শতকেও, সে কথাই লিখেছি। শোষণ-নির্যাতন– প্রশাসনের মানুষ মারা খেলা, অরণ্য- অরণ্য প্রানি– অরণ্য সন্তানদের ছিল, আজও তাই আছে। প্রতিবাদে জ্বলে ওঠা এ কাহিনিও নতুন কিছু নয়। ....আমার লেখার চরিত্রদের যেহেতু শ্রেণি হিসেবে দেখি সেহেতু মনে করি মেয়ে দের বিপন্নতা, নারী মাংসের ব্যবসা, এসবই সত্য। কিন্তু দারিদ্র সীমারেখারনীচে যে জগতটা বড় হচ্ছে ধাঁ ধাঁ করে, সেখানে সকলই শোষিত। কখনো শুনি আমি বিপ্লবের প্রবক্তা। আমি কিছুই নয়।চুয়াত্তরে পৌঁছে সার সত্য উপলব্ধি করেছি। আমি তাই লিখেছি, যা অনন্তকাল ইতিহাসে ঘটে এসেছে।"[৩]

মহাশ্বেতা দেবী মেয়েদের ইতিহাসকে পৃথক করে দেখানোর প্রয়াস করেননি। নারীর অবস্থান শোষিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্য থেকেই চিনে নিতে হয়। তাই একটি মেয়ের গল্প থেকে তিনি একটা শ্রেণির ইতিহাসে পৌঁছে যেতে পারেন। আর সে কারণে বোধহয় মহাশ্বেতা দেবীর কাছে ইতিহাসের মূল অর্থ হচ্ছে অন্তর্তম পুরুষত্বের অন্বেষণ। দেখা যায় নারী-পুরুষের কোন লৈঙ্গিক বিভাজন না ঘটিয়েই তিনি সেই শ্রেণিগত অবস্থানের দিক থেকেই নারী, পুরুষ, শিশু, নির্বিশেষে মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। বস্তুত মহাশ্বেতা দেবী জীবনকে দেখেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমাজের অবহেলিত মানুষরা তাঁর লেখায় এসে ভীর করে দাঁড়ায়। তাদের মুখের ভাষা প্রতি নিয়তই

যেন মহাশ্বেতার লেখায় ইন্ধন যুগিয়ে চলে। আসলে তিনি প্রান্তিকায়িত, বঞ্চিত, অবহেলিত উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ গুলোর কথা বলতে গিয়ে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের ব্যপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মহাশ্বেতার কাছে এই প্রাথমিক বিষয় হল ক্ষুধা। পেটের চেয়ে বড় ধর্ম এই পৃথিবীতে আর কিছু হয় না। তাইতো পেটের খিদেই হয়ে ওঠে তাঁর গল্পের প্রধান মুখ্য চরিত্র।তাই তাঁর অনেক গল্পের বিষয়কে যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যায় একটা ঘটনার আপাত আড়ালে আসলে মানুষের মৌলিক চাহিদা ক্ষুধা নিবৃত্তির বিনিময়ে কীভাবে তাদের শোষণ করা হয় তাই উঠে এসেছে।কখনও আবার তাদের নিজেদের কাছেইক্ষুধা নিবারণই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। যেমন 'ভাত', 'স্তনদায়িনী', এসব গল্পের মূল বিষয় কিন্তু তাই।

বস্তুত মহাশ্বেতা কে আমরা নারীচেতনাবাদী লেখক বলতে পারিনা। কেননা তাঁর লেখার প্রেক্ষিত সর্বভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক অন্তর্কাঠামোতে নিষ্পেষিত হয়ে যাওয়া মানুষের অবস্থার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। তাছাড়া তিনি নিজেও বলেছেন,

> "আমি মানুষকে শ্রেণি হিসেবে দেখিয়েছি। মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা সকলেই শোষিত অবহেলিত। সকলেই বঞ্চিত ....."[৪]

আলাদাভাবে নারীর কথা বলতে গিয়ে বলেন,

> "..... সংস্কারের দাসত্ব, নারীর অবস্থান অতীতে যা ছিলআজও তাই আছে। প্রতিবাদে জ্বলে ওঠা কাহিনিও নতুনকিছু নয়। ..... আমার লেখার চরিত্রদের যেহেতু আমিশ্রেণি হিসেবে দেখি সেহেতু মনে করি মেয়েদের বিপন্নতা, নারী মাংসের ব্যবসা, এসবই সত্য কিন্তু দারিদ্র সীমারেখারনীচে যে জগৎটা বড় হচ্ছে ধাঁ ধাঁ করে সেখানে সকলেইশোষিত....."[৫]

তিনি আরও বলেন,

> "নারীদের শরীরের কারণে বেশি লাঞ্ছিত হতে হয়। সমাজে খোঁজ করলে দেখা যাবে নর-নারী, বালক বালিকা, সকলইবঞ্চিত।"[৬]

মহাশ্বেতা শুধুমাত্র নারী বলে নারীর কথা কখনই বলেননি। তাঁর গল্পেও শুধুমাত্র নারী পরিসর প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়নি। কিন্তু লেখক তাঁর লেখায় যে দর্শন চিন্তাকে তুলে ধরতে চান, তার পাশাপাশি অনেক সময় তাঁর অবচেতনে ঘটে যাওয়া অনেক চিন্তার সমান্তরাল ধারাও বয়ে যেতে থাকে। যা তাঁর রচনায় অবচেতনে হলেও প্রকাশ পেয়ে যায়। মহাশ্বেতার লেখায় নারী পরিসর সন্ধানও ঠিক এরকমই একটি মিশ্র অনুসন্ধানের সুযোগ এনে দেয়। তিনি হয়তো তেমন স্পষ্টকরে নারীর কথা বলতে চাননি, কিন্তু শ্রেণি সংঘর্ষের কথা বলতে চেয়েছেন। যেহেতু শ্রেণি শোষকদের অন্যতম শিকার হচ্ছে নারী, তাই অনেক ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা যখন শ্রেণি সংঘর্ষের কথা বলেন, কাল পরিবর্তনের নিরিখে অবচেতন ভাবে নারীর চলমান পরিসর নির্দিষ্ট সাজ সজ্জায় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর আমাদের বিভিন্ন পর্বে এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে চিনে নিতে হয়।

এই অধ্যায়ের মূল বিষয়টিকে বোঝার জন্য আমরা মহাশ্বেতা দেবীর 'মা' সিরিজের গল্প গুলিকে নির্বাচন করেছি অলোচনা এবং বিশ্লেষণের জন্য। 'মা' সিরিজ বললাম এই কারণেই যে মহাশ্বেতার শ্রেষ্ঠগল্পের গল্পগুলির নামকরণের ক্ষেত্রে 'মা' নামক শব্দটি জড়িয়ে রয়েছে। যেমন, কথা সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে 'বউ' নামক শব্দটিকে লক্ষ করা যায়। যথা, 'লেখকের বউ', 'কেরানীর বউ', 'কুষ্ঠ রোগীর বউ', প্রভৃতি। আবার শরৎ চন্দ্র তাঁর উপন্যাসের নাম করণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন 'বড়দিদি', 'মেজদিদি', 'ছোটদিদি', প্রভৃতি। ঠিক তেমনি মহাশ্বেতারও অনেক ছোটগল্প রয়েছে যেখানে নামকরণের ক্ষেত্রে 'মা' নামক পবিত্র শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে এই সিরিজের গল্প গুলিতে মহাশ্বেতা নি:স্বর নারী

পরিসরকেই তুলে এনেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে। তবে এই শ্রেণির গল্পগুলিতে নি:স্বর নারীর প্রকৃত পরিসর কতটুকু বিস্তৃত হয়েছে এবং কীভাবে কোন পদ্ধতিতে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। তাঁর আগে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনার জন্য নির্বাচিত গল্পগুলি নাম ধারাবাহিক উল্লেখ করা হল,

গল্পের নাম	প্রকাশনী	প্রকাশকাল
১. সাঁঝ সকালের মা	কথাসাহিত্য	১৩৭৩/১৯৬৬ খ্রি:
২. যমুনাবতীর মা	পরিচয়	১৩৭৯/১৯৭২ খ্রি:
৩. যশোমতি	অজ্ঞাত	১৩৭৩/১৯৬৬ খ্রি:
৪. রুদালী	২য় প্রকাশ, প্রতিক্ষণ	১৯৯৬ খ্রি:
৫. স্তনদায়িনী	এক্ষণ	১৩৮৪/১৯৭৭ খ্রি:
৬.হারুন সালেমের মাসি	কথাসাহিত্য	১৩৭৮/১৯৭১ খ্রি:
৭. কুড়োনির বেটা	অনুষ্টুপ	১৩৮৯/১৯৮২ খ্রি:
৮. চিন্তা	২য় প্রকাশ, প্রমা	১৩৯১/১৯৮৪ খ্রি:
৯.নেশা	পত্রিকার নাম অজ্ঞাত	১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি:
১০.গিরিবালা	প্রসাদ	১৩৮৯/১৯৮২ খ্রি:

এই গল্পগুলিতে উঠে আসে সমাজের একেবারে নীচের স্তরের দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাসকারী নারীদের কথা। যারা ন্যায়নিষ্ঠ পরায়ন, যাদের হৃদয়ে কোন পাপবোধ নেই। সর্বদা সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। অথচ এদের উপরই বর্তায় সমাজ কর্তৃক, সংস্কৃতি কর্তৃক, রাজ নীতি কর্তৃক শোষণ–নির্যাতন–নিপীড়ন। তথাপি এদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয় না। অসহনীয় জ্বালা যন্ত্রনা, দু:খ–বেদনা বুকে নিয়ে হাহাকারময় জীবন যাপন করে তারা। নিজে শেষ হয়ে যায় তবুও সমাজের অকল্যান কখনোই কামনা করে না। বরং বলা যায় এদের জীবন ব্রাত্য সীমার গণ্ডী পেরিয়ে কখনো জীবনের অন্যদিকে চোখ মেলে তাকাতেই জানে না। এদের সমাধি স্থলে বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ভুলবসতও কেউ একটি ফুল দেয় না। ভুল বশতও একবারের জন্যেও কেউ মনে করে না নিজের স্মৃতি সত্তায় আকড়ে ধরার কথা। অথচ সমাজের আবর্জনা সরানোর মূল কাজটি করে থাকে এই শ্রেণির মানুষেরা। এই অবহেলিত শ্রেণির মধ্যেই বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গগত ভাবে সবচেয়ে নীচে অবস্থান নারীর। নারীরা একই সঙ্গে দুইদিক থেকেই শোষিত। একে তো নিম্নশ্রেণির মানুষ হওয়ার জন্য অপরদিকে নারী হওয়ার জন্য। মহাশ্বেতার এরকম 'মা' চরিত্র গুলি হচ্ছে, আমদি, যশোদা, চন্ডী বাঁয়েন, রুদালী, শনিচরী, মাদার ইন্ডিয়া, প্রভৃতি। 'মা' বা 'মাতৃত্ব' নামক শব্দটির সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে সন্তান নামক শব্দটি। মায়ের মাতৃত্বের সঙ্গে একমাত্র সম্পর্ক থাকে তার সন্তানের। অর্থাৎ মায়ের মাতৃত্বের পরিপূর্ণ অধিকার থাকে শুধুমাত্র সেই মায়ের গর্ভে ধারণ করা সন্তানের। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'মা' শ্রেণির গল্পগুলিতে 'মা' নামক শব্দটির বিপন্নতার চিত্র তুলে ধরেছেন। মা নামক সম্পর্কটি কীভাবে ক্রয়–বিক্রয়ের বস্তু বিশেষে পরিণত হয়েছে। এই ভোগপণ্যের সমাজে তা দেখিয়েছেন। কখনো মায়ের সেই স্নেহময়ী, বাৎসল্যময়ী, দয়াময়ী, করুণা ও মনের কমলতার জন্য অপরের সন্তান হয়ে উঠেছে নিজের গর্ভে ধারণ করে জন্ম দেওয়া সন্তানের মতো আবার কখনো 'জননী' রূপ ধারণ করেছে পেশাদারী জীবিকা নির্বাহের জন্য। মহাশ্বেতার এরকমই একটি মা চরিত্র 'যশোমতী' গল্পের আমোদিনী।

যশোমতী

প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩/১৯৬৬ খ্রি: পত্রিকার নাম অজ্ঞাত। পুনর্মুদ্রণ : মায়ের মূর্তি, সমকাল প্রকাশনী ১৯৮২ খ্রি:

গল্পে আমোদির সুখের সংসারছিল কোন এক সময়ে। পঞ্চাশের মন্বন্তর সময় রাজনৈতিক ঘেরাটোপে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। যাদের হাজার হাজার বিঘা জমি ছিল তাদের জমিও জবর-দখল হয়েছে। অপরদিকে যাদের জমির পরিমান কম ছিল অথচ পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি ছিল তাদের সম্পত্তিও জবরদখল হয়েছে। সরকারী দমন পীড়ন নীতির কারণে আমোদিরাও আজ অসহায় দরিদ্র এবং অনাহারে জীবন অতিবাহিত করে। এই আমোদি একদিন এলাকার নেতা কেষ্টকে দুধ-ভাত দিয়ে মানুষ করেছে। দেখে শুনে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে তুলেছে। কেষ্ট এখন দেশের নেতা। সে প্রতিষ্ঠিত সচ্ছল এখন আর তার ছোটবেলার সেই দুধ মাকে মনে পরে না। আর দুধ 'মা' অসুমার দারিদ্রে ও অতুলনীয় কষ্টে দিন যাপন করে। এরকমই একটি দুধ মায়ের করুন কাহিনিতে পরিপূর্ণ 'যশোমতি' গল্পটি।

গল্পটিতে একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দুটি নারীর করুন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, আমোদি এবং বেদেনীর মধ্যদিয়ে। পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্বারা বেদেনী বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়াত। যে গান বুক ফাটা হাহাকারের গান, তাঁর হৃদয়ের দু:খের গান, যা হৃদয় খুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

"ভালোবাসা সর্বনাশা আগে নারে জানি
মায়ের চক্ষে হইলাম আমি কূলের কলঙ্কিনী
যার লাইগা কলঙ্কিনী তারে কি ভোলা যায় ?
কলঙ্কিনী হইলাম ভবে তাতে নাইকো দু:খ
বুক মিলাইয়া শীতল করব বুক
হা রে দেওয়ানা খইমালার দু:খ পাসরন না যায়।।"[৭]

শ্রী রাধার মতো কলঙ্কিনী এক নারীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ এই নারীর জীবন। যেখানে শুধুমাত্র রাধারাই কলঙ্কিনী হয়। কিন্তু কৃষ্ণদের কোন কলঙ্ক লাগে না। এই গানটির সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর চন্ডী দাসের রাধার সঙ্গে বেদেনীর জীবনের কথায় যেন একটা মিল লক্ষ করা যায়। শ্রী কৃষ্ণের মতোই বেদেনীর স্বামীর গোপিনী গ্রহনে কোন কলঙ্ক লাগে না। যত কলঙ্কের সৃষ্টি শুধু মাত্র বেদেনীর মতো অসহায় নারীদের জন্য নির্মিত হয়েছে। বেদেনী স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে কারণ তার স্বামী আবার বিয়ে করেছে। নিজের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনার কথা বেদিনীকে বলে, এ যেন এক দু:খিনী আর এক দু:খিনীকে আত্ম নিবেদন করেছে,

"সবই আছিল আমার ঠাইরেন, সবই ছিল জ্বলজ্বলা। ঘরে সতীন আইতে আমি দেশান্তরী অইলাম। আমার বুকের উপর বইয়া তারা হাসবো, খেলবো, আমি নি তাই বইয়া বইয়া দেখুম? তাই আমারে দেশান্তরী দ্যাহেন।.....দ্যাহেন মাঝে মন জ্বলে ঠাইরেন, মাটির তলায় না সন্ধাইলে এই জ্বালা যাইব না।"[৮]

মহাশ্বেতা বেদেনির মধ্যদিয়ে পুরুষ সমাজের নারী নিপীড়নের কদর্য দিকটিকে তুলে ধরেছেন। সমাজ সংস্কৃতিতে আজও অব্যাহত রয়েছে পুরুষের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার স্ত্রী পরিগ্রহনের কথা। অথচ সে ক্ষেত্রে আগের স্ত্রীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অস্থায়ী ও সংকটাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বেদিনীরও এই একই পরিস্থিতি। সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গান গায়। ছেলে মেয়েদের ঔষধ দেয়, শেকড়, কবজ দেয়, বুড়ো বুড়িদের দাঁতের ঔষধ, পেটের রোগের মাদুলি দেয় বিনিময়ে যা পায় তাই দিয়ে জীবন যাপন করে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আশ্চর্য সমীকরণ বেদিনী নিজেই তৈরি করে নেয়। এখানে বেদিনী নিজেই নিজেকে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টায় সার্থক। স্বামী সঙ্গম, স্বামী সুখ না পেলেও জীবনের লড়াইয়ে বেদেনী জয় লাভ করেছে।

অপরদিকে আমোদি তার দুধ ছেলেকে সর্বদাই স্নেহময়ী জননীর দৃষ্টিতেই দেখেছে। কাছে না থাকলেও দূর থেকে তার প্রতি স্নেহ পূর্ণ আশীর্বাদ করেছে। কোন শিশু কে দুধে ভাতে প্রতিপালন করলে সে ছেলের প্রতি মায়েরও স্বাভাবিক কারণেই একটা মৌলিক অধিকার স্থাপিত হয়ে যায়। আর সেই অধিকারেই অভিমান করে আমোদি ছেলে প্রহ্লাদকে বলেছে,

> "আমাদের পানকেষ্ট মাকে জন্মে দ্যাকেনি, তার নামে স্কুলদিলে, ছিনেমা বাড়ি দিলে, দুধ মা-কে কিছু দিতে নেই?....বাছার আমার দুধ – মা বলে টান তো আছে। তাই বলি আমারে একবার যেতে দে তোরা। আমারে ধর, যদি কিছু এট্টা দেয়, তো নেড়েচেড়ে তুই খেতে পারবি, পেশাদি খেতে পারবে, তাই বলি।"[৯]

আমোদি বুঝতে পারেনি এই কেষ্টর কত লীলা। তাই নারীকে যে কোন রূপে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার পর পুরুষের আর কোন আগ্রহী থাকে না তার প্রতি। যশোদারা শুধু পালিকা মা হয়েই থাকে জন্মদাত্রী মা হতে পারে না। এই দিক থেকে মহাশ্বেতা দেবীর এই চরিত্রটির নামকরণ পরিপূর্ণ স্বার্থক বলেই মনে হয়। তবে একটু তফাৎ রয়েছে কেননা ভগবান কৃষ্ণ বা কেষ্ট সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য রূপ পরিবর্তন

করত আর আলোচ্য গল্পের কেষ্ট ঠিক তার বিপরীত কাজটি করেছেন। আর সে কারণেই প্রসাদি তার মা আমোদিকে বলেন, -

> "তবেই দ্যাখ মা, তোমার কেষ্টর পরীক্ষা কতরকম তা দেখ। আমাদের ধান জমি নেই। চাষ আবাদ নেই। পিতৃ পুরুষের জিনিস টুকু নেড়ে চেড়ে খাব তার পথ নেই। ছোট খুড়ো তো সেই জন্যে বলে, পেল্লাদ, নিজের গাঁয়ে বাস, বর্তমানে কুলি গিরি করিস, সে তো ভিক্ষেরই সামিল। উদিকে দ্যাখগা যা, যাদের তেলা মাথা তাদের অবস্থা চচ্চড়িয়ে উঠছে। তা আমি বলি চলনা ক্যান, শত্তরে যেয়ে ভিখিরি হই।"[১০]

বলার অপেক্ষা রাখেনা আমোদিদের জীবন যাত্রায় অভাব কতটা চরমে পৌঁছেছে যে আজ তা জীবিকা নির্বাহের কাজ হিসেবে বেছে নিতে চাইছে ভিক্ষিরির কাজ। আমোদিরা ভেড়ির ধারে যায় সেখানে জলের ধারে শুশনি শাক, কলমি শাক, থানকুনি পাতার সন্ধানে কেননা এরা এই শাক পাতা সংগ্রহ করে রাসমনির কাছে বিক্রি করে। সে আবার গড়িয়ার বাজারে গিয়ে এগুলি বিক্রি করে। এভাবেই চলে আমোদিদের সংসার। আমোদি যেতে চায় কেষ্টর কাছে উদ্দেশ্য একটাই সেকি তার দুধ-মা -কে ভুলে গেছে। তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। তারও যে একটা প্রাপ্য আছে সে অধিকার টুকু জানানোর জন্য। বাসিনী ঠাট্টা করে বলেছিল হাসতে হাসতে, -

> "তুমি যাবে দিদি? তা যাও। কেষ্ট রাজা হলে নন্দরানী তো যাননি, তা তুমি যাও। দেখ তোমার কেষ্ট ছেলে কি বলে।"[১১]

পুরানের নন্দরানী থেমে থাকলেও আলোচ্য গল্পে নন্দরানী থেমে থাকেনি। তাইতো সে গেছে তাঁর দুধ ছেলে কেষ্ট সমাদ্দারের কাছে। সমাদ্দারদের স্কুলে জনমহতিসভা বহু লোকের সমাগম, বিশিষ্ট ব্যক্তি বি. ডি. ও. ও উপস্থিত এই সভাভর্তি লোকের সামনে গিয়ে

আমোদি তাঁর কেষ্ট ছেলের কাছে নিজের পিতৃ পুরুষের ভেড়ির কথা বলে। এই ভেড়িই যে তাদের একমাত্র শেষ সম্বল।

> "তোমার কেমন কান্তি বাবা, কত নাম। আমার পেল্লাদের অবস্থা যে, দিন হতে দিনে মন্দ হচ্ছে বাপ আমার। তা দুধ মার জন্যেই তো মহা-পেরানিটা জীয়ে আছে বাপ, আমার জন্যেতো কিছুই করলে না ? ঐ ভেড়িতা দাও না বাপ উদ্ধার করে? তোমার দুদ- মা হয়ে ত্যানা পরে গোবর কুড়োই..... মানুষ কত ঠাট্টা করে, আমি বলি আমার প্রান কেষ্টর গৌরবে আমার গৌরব। ....ও ভেড়ি যে আমার পিত্তি কেলের সামগ্রি বাবা। নিবড়ের টাকার গরম আছে বলে বাসিনী বলে, তাই বলে তুমি অন্যায় করতে পার ? আমি যে তোর যশোমতি মা, ও বাপ প্রানকেষ্ট?"[১২]

স্বজন তোষনের নজির দেখিয়ে আপন কর্তব্য থেকে দূরে থাকা এবং গরীবকে শোষনের এটাই যে রাজনৈতিক কৌশল। এরকমটাই হয় দুধে ভাতে সন্তান পালন করলে, সে সন্তান যদি দেশের নেতা হয় তবুও তার মাকে সেই সন্তানের কাছে ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। আর এই ভিক্ষে করার ফল স্বরূপ কি যে পাওয়া যেতে পারে তা মহাশ্বেতা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

> "প্রানকেষ্ট বিরাট একটি হা করল ও এমন একটি গর্জন করলো যে আমোদির মাথা ঘুরেগেল। প্রান কেষ্ট তাকে অনেক কিছু বলতে লাগলো। রাগের মাথায় দেশের ভাষাতেই কথাগুলো বলল, ...তাদের ভেড়ি তাদের দিলে সবাই বলবে প্রান কৃষ্ণ স্বজনকে তুষছে ? দেশ সুদ্ধ লোক জানে চাষের জন্য জল দরকার আর আমোদী সে কথা জানেনা ? প্রাণ কৃষ্ণ আমোদির খেয়েছে বটে কি তা বলে সে

> কুপুত্র হতে পারবে না। সে কি প্রহ্লাদ নাকি, যে স্বার্থ পরের মতো শুধু নিজের কথা ভাববে? আমোদির শুধু মনে হল, বাপরে, তার বুকের দুধে এত শক্তিও ছিল?”[১৩]

মহাশ্বেতা এখানে প্রাণকেষ্টর মধ্যদিয়ে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের প্রকৃত রূপকে তুলে ধরেছেন। যিনি দেশের নেতা, দশের নেতা, সমাজের নেতা; এই দেশের ও দশের কল্যানের জন্য নিজেকে একে বারে সমর্পন করে, সভায় সভায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সাধারণ ভোটাধিকার যুক্ত মানুষদের জাগিয়ে তুলে। তারাই আবার নিজের পালিকা দুধ-মাকেও দুর দুর করে তাড়িয়ে দিতে পারে সামান্য কিছু আহার্য দানের ব্যবস্থার পরিবর্তে দশের কাছে ভালো থাকার নামে আত্মসাৎ করার ছলে। তাইতো প্রসাদী ও একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বলে দেয়,

> “আর চেঁচিওনি বাবু, মা-কে আমার নে যাচ্ছি বাপরে তোমার গলা! মায়ের দুধে শক্তি ছিল বটে যে শক্তি টুকু ছিল সব তোমারই কি দিইছিল? তাই ভাবি।”[১৪]

মহাশ্বেতা এখানে প্রসাদির মধ্যদিয়ে যেন পৌঁছে দিয়েছেন কেষ্টর মতো দেশের সমস্ত নেতাদের দরবারে। যে কথাটি আমোদি বলতে পারলেন না কেষ্টর দুধমা হয়ে সে কথাটি বলেছে কেষ্টর বোন প্রসাদি। প্রসাদি যেন কেষ্টকে তার ক্ষমতার অপব্যহারের কথা মনে করিয়ে দিতেই বলে, আজ যে চিৎকারের শক্তি টুকু তুমি পাচ্ছ তা এই মারই দেওয়া। এবং এই সমাজের যে নেতার আসনে বসেছে এখানেও রয়েছে মায়েরই কর্মের ফল। কেননা এই দুধ – মা- রা না হলে কেষ্ট বাবুর মতো বড় বড় দুধ ছেলে নেতারা পৃথিবীতে আসার কিছুদিনের মধ্যে ফিরে যেতে হত স্বর্গের রাজ্যে। কিন্তু এটাই যে পৃথিবীর নিয়ম এই নিয়মই প্রচলিত হয়ে আসছে সেই পুরান রচনা কালের সময় থেকে। এ সত্য কথাটি আমোদি সর্ব শেষে বলে দেয়,

> "আমি কেন মরতে গেনু বল দি,নি? যশোমতি তো মথুরায় যায়নি? আমি কেনে বা শাস্তর ভুলে যেতে গেলু। যশোমতি যায়নি মানে বুঝলি না? যেতে নেই যেতে নেই, গেলে ঐ দশাই হয়। সে জন্য যায়নি।"[১৫]

লেখিকার সর্বশেষ উক্তি "এতক্ষনে চোখের জলে আমোদীর বুকের কাপড় ভেঁসে গেল।" এই 'শাস্তর' শব্দটি নারীর বিরুদ্ধে পিতৃতন্ত্রের তৈরী করা সব বিধি নিষেধের অন্ত:সার শূন্যতাকে শ্লেষবিদ্ধ করছে যেন। নারীর বিরুদ্ধে সব নিয়মের বেড়াজাল তো পিতৃতন্ত্রের সুবিধার খাপে তৈরি, তাই সেখানে নারীর নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার কোন মূল্য ধার্য হয় না। তাই আমোদীর দুধ-মা এর মহার্ঘ সম্পর্কটুকু কেষ্টদের মতো সন্তানদের কাছে প্রয়োজনের নীতিতেই ফুরিয়ে যায়। তাই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা আমোদীর মতো সহজ সরল মাতৃহৃদয় আসল বস্তুর সারৎসার টুকু অনুভব করতে পারে না। বুঝতে পারে অন্তিমে যখন নিরবে নিরালায় একাকিত্বে ভাবনার জগতে চলে যায় তখন। কিন্তু সে সময় আর বলারও কিছু থাকেনা আবার করারও কিছু থাকেনা। নদীর স্রোতের মতো অশ্রুধারা ঝরানো ছাড়া।

‘স্তনদায়িনী’

প্রথম প্রকাশ, ‘এক্ষণ’ বর্ষ ১২, সংখ্যা ৩-৪, শারদীয় ১৩৮৪/ ১৯৭৭ খ্রি:

মহাশ্বেতার এরকমই আর একটি দুধ মায়ের কাহিনির গল্প ‘স্তনদায়িনী’ গল্পের শুরুতেই মহাশ্বেতা একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন, “মাসি পিসি বনগাঁ বাসী বনের মধ্যে ঘর/কখনো মাসী বলল না যে খই ময়াটা ধর।”১৬ এই প্রবাদের মধ্য থেকেই প্রকৃত পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই গল্পেও কোন এক স্বার্থমগ্ন দুনিয়ার কথাই বর্ণিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র যশোদা। তাঁর স্বামী কাঙালীচরন হালদার বাড়ির স্টুডিবেগারে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে। অচল সংসারে সন্তান ও স্বামীর ক্ষুধা নিবারনের দায়িত্ব যশোদা নিজেই তুলে নেয় তাঁর নিজের মাথায়। যশোদার এই মমতাময়ী রূপের কথা মাথায় রেখে মহাশ্বেতা নিজেই বলেছেন,

> "যশোদা একেবারে ভারতীয় রমনী, যে রমনীর যুক্তি বুদ্ধি – বিচারহীন স্বামী ভক্তি, ও সন্তান প্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ তিতিক্ষার কথা, সতী সাবিত্রি সীতা থেকে শুরু করে নিরুপা রায় ও চাঁদ ওসমানি পর্যন্ত সকল ভারতীয় নারী জনমানসে জাগিয়ে রেখেছেন।"[১৭]

আলোচ্য গল্পে যশোদার ত্যাগ তিতিক্ষার কথা, কায়িক পরিশ্রম স্বীকার একে বারেই বাস্তবিক। কেননা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীর এই মমতাময়ী রূপের বর্ণনা আদিম ভারত থেকেই চলে আসছে। সাবিত্রী তার মৃত স্বামী সত্যবান কে জীবিত করে তোলে। বেহুলা লখিন্দরকে স্বর্গ রাজ্য হতে নিজের সতীত্বের প্রমান দিয়েই জীবিত করে নিয়ে আসে। জগৎ জননী গৌরী বিষপান কারী নীলকণ্ঠ শিবকে শিশু জ্ঞানে স্তন্যপান করিয়ে বাঁচিয়ে তুলেন। পুরানে বর্ণিত এসব নারী সতীত্বের আখ্যা পান কিন্তু স্বামীকে বাঁচিয়ে কিংবা স্বামী–সম্পর্কটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েই। এই একই কারনে রাধা শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ট সাধিকা হ্লাদিনী শক্তি হয়েও পরকীয়ার দুণাম ঘুচেনি তার। কিন্তু সতীত্ব তার থেকে অনেক দূরেই থাকে। আর সে কারনেই বোধয় মহাশ্বেতার গল্পে নারীর আপ্তবাক্য গুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়,.....

> "স্ত্রী লোকের জান কচ্ছপের প্রায়'
> 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'
> 'পুড়বে নারী উড়বে ছাই
> তবে নারীর গুন গাই।"১৮

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মহাশ্বেতা এখানে নারী শোষনের দিক গুলিকেই চিহ্নিত করেছেন। এই গল্পে ব্যবহৃত প্রবাদগুলি নারীর অবহেলার অবমাননার, বঞ্চনার এবং নীরবে সমস্ত কষ্ট প্রতিবাদ হীন ভাবে সহ্য করার দিকগুলিকে নির্দেশ করেছে। ভারতীয় রমনীরা যেন মাটির গুনেই জননী হয়ে ওঠে এখানে পুরুষ সমাজের কোন ত্রুটি – বিচ্যুতি নেই। নারীর জননী হয়ে ওঠার ইচ্ছা–অনিচ্ছার কোন বিষয় নেই। জননী হতে হবে এটাই

মূল কথা। অথচ বাইরের জগতে পুরুষরা কীকরছে না করছে সেদিকে কোন শাস্ত্র সমাজ কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু বাড়িতে এলে সেই সতীসাধ্বি পতিপরায়না স্ত্রী থাকা আবশ্যিক ব্যাপার। কেননা নারীরা ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলে বাইরে বের হলেই শত সহস্র ত্রুটির পাহাড় নির্মাণ করে পুরুষসমাজে কিন্তু তাদের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সহমর্মী, সহযোগী সত্তাকে কখনই স্বীকার করা হয় না। যশোদার ক্ষত্রেও তাই হয়েছে। তবে যশোদার মমতাময়ী রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে মহাশ্বেতা প্রতিবাদের ভাষাতে জানিয়েছেন সমাজ ব্যবস্থার কদর্যময় দিকটিকে।

> "যশোদার এই স্বামীর প্রতি বাৎসল্য ভাবটির কথা জ্ঞানিমুনিরা লিখে যাননি। তারা প্রকৃতি ও পুরুষ এইভাবে নারী পুরুষকে ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু তা করেছেন আদিযুগে – যখন অন্য দেশ থেকে তার এই পেনিন সুলায় প্রবেশ করলেন। ভারতের মাটির গুন এমনই যে এখানে রমনীরা সবাই জননী হয়ে যায় এবং পুরুষরা সবাই গোপাল ভাবে আপ্লুত থাকে। সকল পুরুষই গোপাল ও সকল রমনী নন্দ রানী এ ভাবটি যারা অস্বীকার করে নানা রূপ 'ইটারনালশী'- 'মোনালীসা'– 'লা পাসিওনারিয়া' – 'সিমন দ্য বোভোয়া' – ইত্যাদি পছন্দমতো করেন পুরনো পোস্টারের উপরে সাঁটতে চান ও মেয়েদের সেভাবে দেখতে চান, তাঁরাও এ ভারতের ছানা পোনা। তাই দেখা যায় শিক্ষিত বাবুদের এ সকল অভীপ্সা বাইরের মেয়ে ছেলেদের জন্যে। ঘরে ঢুকলে তারা বিপ্লবিনীদের মুখে ও ব্যবহারে নন্দরানীকেই চান।"[১৯]

বস্তুত নারীর অবস্থা অতীতে যা ছিল বর্তমানেও তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে এ কথাই যেন মহাশ্বেতা আমাদের জানিয়ে দেন নতুন ভাবে। আর যে সব আইন হচ্ছে ঘটা করে এসবই শুধুমাত্র পুরনো রীতির আড়ালে নতুন এক রীতির প্রচলন ছাড়া আর কিছু না। কেননা বাইরের কেতাবি শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে শুধুমাত্র নারীর মৌলিক

অধিকারের বিষয় গুলি আলোচনার বিষয় হিসেবেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু বিষয়ী করতে পারেননি। সমাজের কথা ভাবছেন কিন্তু হৃদয়ের অন্ত:স্থলে লুকিয়ে থাকা কালো দাগটিকে মুছে ফেলার কথা ভাবেননি। তাইতো ঘরের বাইরে সমাজের নারী উন্নয়নের স্বপক্ষে দামী দামী বক্তব্য রাখেন কিন্তু ঘরে এসে নিজের স্ত্রীকে করে রাখেন বঞ্চিত। নারীর উন্নয়নের জন্য তাদের মৌলিক অধিকারের জন্য সংবিধানে যে সব নীতি নিয়ম রচিত হয় বাস্তবে তার প্রয়োগ যে কতটুকু হয় সে বিষয়ে সংসয় থেকে যায়। নারীরা বাইরের জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটবে আর তা যদি ঘটে তবে সমাজের পুরুষের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবে। সে কারনেই নারীকে দমিয়ে রাখতে হবে ক্ষমতা বা প্রতাপের দ্বারা এটাই হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থার মূল বিধান। এই প্রসঙ্গে মহাশ্বেতার নিজস্ব জীবনের পারিবারিক চিত্রকে তুলে ধরেছেন সমাজ ব্যবস্থার মূল রূপটিকে চিহ্নিত করার জন্য,

> "কোন যুগেই জ্ঞানি পুরুষ বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকতে দেয় না। দিদিমার কাছে শুনেছি জনৈক ভদ্রলোক তার বাড়িতে এসে 'শনিবারের চিঠি' পড়ে যেতেন। কদাচ ঘরে বইটি ঢোকাতেন না। বলতেন 'বউ – মা-বোন যে এই কাগজ পড়বে, সেই বলবে আমি নারী। মা নই, বোন নই, বউ নই ! ফলে কী ঘটবে, তা জিজ্ঞেস করলে বলতেন – চটিপরে ভাত রাধবে। নতুন হাওয়ার প্রকোপে অন্দরে অশান্তি হয়, এ চির কালের নিয়ম।"[২০]

নারীকে চিরকাল যে দমিয়ে রাখা হয়েছে এবং নারীকে জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে বিরত রেখে ছিল পুরুষ সমাজ সে কথাই মহাশ্বেতা উল্লেখ করেছেন। নারী মাংসের ব্যবসা যা অতীতে ছিল তা বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে যতদিন না পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কাঙালীর মুখদিয়ে সে কথাই বের করেছেন মহাশ্বেতা,

> "দুপুর নাগাত পেটে ভাত পড়লে যশোদার প্রতি তাঁর বাৎসল্য ভাব জাগে এবং যশোদার স্ফীত স্তন নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর নাগাদ ঘরে ফিরতে ফিরেত কাঙালী যেন অদুর সুখের কথা ভাবছিল এবং সুবর্তুল স্তনের কথা ভেবে সে স্বর্গ সুখ পাচ্ছিল। কচি মেয়ে বিয়ে করে তাকে কম খাটিয়ে প্রচুর খাওয়ালে আখেড়ে দুপুরে সুখমেলে এ কথা চিন্তা করে তার নিজেকে দুরদর্শী পুরুষ বাচ্চা মনে হচ্ছিল।"[২১]

নারী দেহ পুরুষের খেলার বস্তু হয়েই চলে আসছে আজীবন ধরে। নারীর শরীর, মন, মাংস পিন্ড কোনটাই নারীর নয়! অদৃশ্য ভাবেই এসব কিছুর মালিক হয়ে দাঁড়ায় স্বামী নামক পুরুষ মানুষটি। কুটকৌশল এতটাই প্রখর ভাবে প্রবাহিত করেছে নারী সমাজকে যে তারা নিজের ইচ্ছা – অনিচ্ছার বিষয় টুকু পর্যন্ত ভুলে যেতে বাধ্য হয়। তাইতো যশোদা কুড়িটি সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণভাবে বিনম্র নিবেদন করে,

> "তুমি স্বামী, তুমি গুরু যদি বিস্মরণ হয়ে নানা করি, তুমি সোঙরে দিও। কষ্ট আর কী বল? গিন্নিমা কি তেরটা বিয়োয়নি? গাছের কী ফল ধরতে কষ্ট হয়।"[২২]

যশোদার মুখের নিজের কথা নাকি তার উপর চাপিয়ে দেওয়া পিতৃতন্ত্রের শেখানো বুলি যা অদৃশ্য শক্তি দিয়ে তাকে ভিতর থেকে বলাচ্ছে। তা সে নিজেও জানেনা।তারা শুধু জেনে এসেছে নারী জন্ম সার্থক হয় বহু সন্তান এবং অবশ্যই পুত্র সন্তানের মা হতে পারলেই। উচ্চ- মধ্য-নিম্ন প্রত্যেক শ্রেণির নারী ঐ শাসন থেকে মুক্ত নয়। কেননা উচ্চ শ্রেণির নারীর প্রতিভূ হালদার বাড়ির গিন্নিও নিতান্তই কম সন্তানের মা হয় নি (১৩টি সন্তান জন্মদেন)।

কিন্তু যশোদা যেহেতু একই সঙ্গে বর্ণ-বর্গ এবং লিঙ্গগত ভাবে ব্রাত্য তাই একই সঙ্গে দুরকম শাসন পদ্ধতি চলতে থাকে তার উপর। একদিকে পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের জীবন, অন্যদিকে আবার পারিবাড়িক পরিমন্ডলে স্বামী নামক প্রভুত্বের শিকার হয় সে। কেননা যার কোন কিছুই নেই তার সমান্য কিছুই অনেক বেশি হয়ে দেখাদেয়। হালদার বাবু কাঙালীকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাকে চলার ব্যবস্থা করে দিবে মুড়ি–মুড়কির দোকান করে দেবে যতদিন দোকান হবে না ততদিন হালদার বাড়ি থেকে সিধা আসবে যা দিয়ে যশোদার পরিবার ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটবে। অন্নহীন মানুষের কাছে সামান্য খাবারই অমৃত হয়ে দেখা দেয়। তাইতো কাঙালী আহ্লাদে যশোদাকে বলে,

> "সে যে কালিদাশের শ্লোক আছে নেই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথায় পেতে? আমার কপালে তাই হল রে। বাবু বলেছে ছেলের বিয়ে মিটলে রকে দোকান করে দেবে। যদ্দিন না দিচ্ছে, তদ্দিন সিধে পাঠাবে। ঠ্যাং থাকলে কী এরকম টা হত? সবই মায়ের ইচ্ছে।"[২৩]

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে বাস্তব সত্য হল পেটের ক্ষুধা। পঙ্গুত্ব জীবন যাপনের থেকেও বড় হয়েছে দুবেলা অন্নের ব্যবস্থা। তাই কাঙালী দের পঙ্গুত্বও যেন প্রতীকী হয়ে উঠে। ক্ষুধার বিনিময়ে তারা সমাজ নিয়ন্তাদের উদ্যগ্র আগ্রাসনের কাছে পঙ্গু হয়ে যায়। এক শ্রেণির মানুষ আখের গোছানোর তীব্রতায় আনন্দে, আলো ঝলমলে রাজ মহলে বসবাস করে। আর এক শ্রেণির মানুষের পেটের ভাত নেই, কাপড় নেই, মাথা গোজাবার কোন ঠাই নেই, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, ক্রীতদাসের জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এই অভ্যস্ত জীবন যাপনের কোন পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন হতেও পারে না। তাইতো কাঙালীর দোকান আর গড়ে ওঠে না। পঙ্গু জীবনের কোন ক্ষতিপুরণেও পায় না।

এই শোষনের মাত্রা আরও বেশি প্রখর হয় যশোদার মধ্যদিয়ে। পঙ্গু স্বামী–সন্তান দের নিয়ে বিপাকে পরেই যশোদা আসে হালদার বাড়িতে কাজের সন্ধানে। হালদার বাড়ির গিন্নিমা দেখেন যশোদা স্বাস্থ্যবতী সুন্দর ও সুঠাম তার চেহারা অতএব যশোদা যদি এ বাড়ির দুধ-মা হয় হালদার বাড়ির সন্তান দের দুধপান করায় তবে হালদার বাড়ির বধুরা সুস্থ থাকবে শরীরের কোন ক্ষতি হবে না। ফলে চেহারা ভালো থাকবে, সোন্দর্য বোঝায় থাকবে এবং তার ছেলেরা অন্যকোনো বউ বা মেয়ের দিকে দৃষ্টি দেবে না। পিতৃতন্ত্রের কুৎসিততম চেহারাটিকেই তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা। স্ত্রীকে যে শুধু স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য নিজেকে সাজিয়ে রাখতে হয় তাই নয়, পুরুষের পরনারী গমনের মতো সত্যটিও এর পেছনে কাজ করে। সুতরাং যশোদা যদি দুধমা হয় তাহলে একই সঙ্গে দু-তিনটি কাজ হয়ে যাবে, একে বাচ্চাদের দুধদান, দুইয়ে, বাড়ির ব্রাক্ষ্মনের পূজা পাঠের কাজ এবং তিনএ কাঙালীর পঙ্গুত্ব জীবন যাপনের জন্য দায়ি যে হালদার বাড়ির সন্তান তার পাপও লাঘব হবে। এই অভিপ্রায়ে যশোদা হয় হালদার বাড়ির দুধ মা।

যশোদা হালদারবাড়ির জননীত্ব অর্জন করে ধীরে ধীরে ত্রিশজন সন্তানকে লালন পালন করেন। নিজের এবং হালদার বাড়ির মিলিয়ে সর্বমোট পঞ্চাশজন শিশুকে দুধদেয় ও মানুষ করে। কিন্তু বিনিময়ে পায় সামান্যকিছু অর্থ, পূজোয় পার্বনে কাপড়, মাসান্তে কিছু টাকা এবং কিছু খাবার যা দিয়ে নিজের পরিবারকে বাচিঁয়ে রাখেন যশোদা। এইভাবে জীবন যাপন করতে করতে যশোদা প্রকৃত পক্ষের একজন প্রফেশনাল মাদারে পরিনত হয়। তাঁ মাতৃত্ব যে নিষ্পাপ সে বিষয়ে নিশ্চিত মহাশ্বেতা মায়ের প্রকৃত রূপকে প্রকাশ করার জন্য বোধহয় সাধন মার্গের গানটি উল্লেখ করেছেন,

" মা হওয়া কী মুখের কথা
শুধু প্রসব করলে হয়না মাতা।"[২৪]

এই জগত জননী দুধ মা'র শেষ পরিনতি মোটেও স্বাভাবিক নয়। যশোদার যতদিন প্রয়োজন ছিল ততদিন যশোদা হালদার বাড়ির ঈশ্বর। যখন যশোদার প্রয়োজন শেষ,

যশোদা আর কাজ করতে পারবে না সে দুধ মা হয়ে থাকার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে তখন তার প্রয়োজনও ফুড়িয়েছে হালদার বাড়িতে। তাই তো যশোদা বেরিয়ে পরে হালদার বাড়ি থেকে। যশোদা এখন অচল সে চলতে পারে না। তার জীবন তরীর শেষ নোঙরখানি তীরে এসে থেমে গেছে তাইতো হালদার বাড়ির বউয়েরা তাকে বের করে দেয় বাড়ি থেকে। স্বামী কাঙালী তাকে ত্যাগ করে, নিজের এবং হালদার বাড়ির সন্তানেরা যাদের জন্য যশোদা দুধ মা হয়েছে, তারাও সবাই সুর ফিরিয়েনেয় যশোদার কাছ থেকে। নিজের সন্তানেরাও আজ আর মা কে চেনে না। কাঙালীও অন্য নারী নিয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করে। তাইতো যশোদা জীবনের অন্তিম বিষাদে তিক্ততার সত্যটি উপলব্দি করে এবং বলে কাঙালীকে,

> "বসে বসে রাধত কে? বেটা ছেলে এনে দেয়, মেয়ে ছেলে রাধে বাড়ে। আমার কপালে সকলই উল্টা হয়ে ছিল। আমার ভাত খেয়েছ যখন, তখন আমাকে ভাত দেবে এখন। ন্যায্য কথা।"[২৫]

কিন্তু যশোদার এ প্রতিবাদ ধোপে টিকে নি। 'কাম খতম তো বাঁত খতম' এই রীতিতেই বিশ্বাসী যশোদার স্বামী সন্তান এবং হালদার বাড়ির লোকেরা। স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত যশোদার স্তন ফেঁটে পচা পুজ বেরতে থাকে যার দুর্গন্ধে ভরে ওঠে হাস পাতাল। এই অন্তিম শয্যায় তাকে এক গ্লাস জল দেবারও কেউ নেই। তাইতো যশোদা হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায় সজ্জিত হয়ে অর্ধচৈতন্য অবস্থায় ভাবতে থাকে তার কৃতকর্মের ফল,

> "যাদের পেটে ধরেছিল বলে দুধ দেয় ভাতের জন্য যাদের দুধ দেয়, যশোদার মনে হল সেতো বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে, তবে সেকি একলা মরতে পারে? যে ডাক্তার রোজ দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে

> চুল্লিতে দেবে সে ডোম, সবাই তার দুধ ছেলে। বিশ্ব সংসারকে দুধে–পাললে যশোদা হতে হয়।”[২৬]

অবশেষে হাসপাতালেই যশোদার মৃত্যু হয় এবং তার শেষ সংস্কার হয় ডোমের হাতে। যশোদা কোন প্রতিবাদ করেননি, নিজের এই বঞ্চনার। তার প্রতিবাদ, প্রতিবাদ হয়ে ওঠেনি তাইতো মহাশ্বেতা নিজেই যশোদার হয়ে গল্পের প্রধান প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছেন বারংবার এবং গল্পের শেষে প্রতিবাদটিও লেখিকা নিজেই তুলে নেন ও বলেন,

> “যশোদা যা সব ভেবেছিল, ঠিক তাই তাই হল। যশোদা ঈশ্বর স্বরূপিনী, সে যা ভাবে অন্যেরা ঠিক তাই করে, তাই করল। যশোদার মৃত্যুও ঈশ্বরের মৃত্যু এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।”[২৭]

মহাশ্বেতা একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষ তার প্রয়োজনে মানুষকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে পূজা করে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল সেই মানব রূপী ঈশ্বরকে নরকের কীট বানিয়ে ছেড়ে দেয়। তাইতো যশোদার মৃত্যুও শুধুমাত্র একজন সাধারণ নারীর মৃত্যু নয়। যশোদার মৃত্যু মানে অধিষ্ঠাত্রি দেবী ঈশ্বরীরও মৃত্যু। তবে মহাশ্বেতা পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মাত্রাতিরিক্ত শাসনের কথা তুলে ধরেছেন। এই প্রেক্ষিতে যশোদার স্বামী কাঙালীর যশোদাকে বলা শোষণতান্ত্রিক রাজনীতির স্বার্থমগ্ন কথাটি উল্লেখ করা যায়,

> “পেটে সন্তান থাকলে তবে তো তোর বুকে দুধ আসবে। এখন সে কথা ভেবেই তোকে কষ্ট করতে হবে। তুই সতীলক্ষ্মী। নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি, ...পেটে সন্তান এলে তবেই তোর বুকে দুধ আসবে”[২৮]

কাঙালী নিজের চাওয়া পাওয়া, কামনা বাসনার কথা মাথায় রেখেই বলেছে। 'পেটে সন্তান এলে তবেই তোর বুকে দুধের যোগান দেবে।' এখানে যশোদার শরীরই প্রকৃত বিষয় হয়ে দেখা দেয় কাঙালীর কাছে। আবার একই ভোগ্যপণ্য লম্পট নবীনও যশোদার যে নরম মাংস পিণ্ডের জন্য কোনো এক সময় লালা ঝরছিল। গল্পের অন্তিমে যশোদার করুন পরিনতির দিকে তাকিয়ে সেই নবীনই যেন গোটা পুরুষজাতিকে শোধরে নেওয়ার কথা বলেছে। স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত অচৈতন্য যশোদার শেষ পরিনতি দেখে নবীনের মুখ থেকে বের হয় সেই দার্শনিক চিন্তা ভাবনার কথা।

> "যশোদার ক্ষতাক্রান্ত স্তন দেখার পর তাঁর গাজা চরস – মদ – জনিত ঘোলাটে মাথায় বহু দার্শনিক চিন্তা ও দেহতত্ত্বের কথা মিথুন মত্ত ঢোঁড়া সাপের মতো মন্থর খেলা করে। যেমন,- ওর জন্যেই এত আকুলি বেকুলি ছিল ? সেই মন মাতানো বুকের এই পরিনাম? হো: মানব দেহ কিসসু নয়। তার তরে পাগল হয় যে সেও পাগল।"[২৯]

দুটি পুরুষের চোখেই যশোদার অস্তিত্বের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায় তার শরীর–সুবর্তুল স্তনদুটি। তাই একজন যখন কর্মক্ষম করে রাখতে তৎপর তো অন্যজন এর দুর্বিসহ পরিনতিতে মাতাল অবসার ও শোকে বিহ্বল। এ এমন এক সমাজ যেখানে নারীর মূল্য ধার্য হয় শরীরের বিনিময়ে। তাই উঁচুতলা কিংবা নিচুতলা উভয় শ্রেণির নারী লাঞ্ছিত হয় যৌনতার প্রেক্ষিতে। যেখানে মা কিংবা স্ত্রী সব সম্পর্কই পণ্যের তোলায় পরিমাপ করা হয়। মায়ের শ্রম কোন সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক মূল্যের স্বীকৃতি পায় না। কেননা বাইরে থেকে এক স্নেহময়ী, আশ্রয়দাত্রী ইত্যাদি মোড়কে পুরে রেখে ভিতর থেকে ফুটো করে দেওয়ার এই কৌশল পিতৃ তন্ত্রের বহু পুরণো। সাংস্কৃতিক রাজনীতির এই জঘন্য দিকটিই আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয় এই গল্পে।

‘সাঁঝ সকালের মা’

প্রথম প্রকাশ : ‘কথাসাহিত্য’ ১৩৭৭/ ১৯৭০ খ্রি:

‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পে পাই অন্য আর একজন স্বতন্ত্র ‘মা’ চরিত্রকে। যার নাম জটি ঠাকুরানি। জটি মেদিনীপুরের পাখমারা যাযাবর সম্প্রদায়ের মেয়ে। সে উৎসবকে ভালোবেসে বিয়ে করে। পাকমারাদের সমাজের মানুষেরা অন্যকোন সমাজের মানুষকে বিয়ে করে না। কিন্তু জটি এই সামাজিক ধর্মীয় বিধি ভঙ্গকরে উৎসবকে বিয়ে করে। এবং তাদের সমাজ থেকে অনেক দূরে চলে যায়। তাদের ভালোবাসার ফসল স্বরূপ সৃষ্টি হয় সাধনের কিন্তু একদিন চোলাই মদ খেয়ে উৎসবের মৃত্যু হয়। ফলে জটি পরে যায় বিপাকে সে এই চঞ্চল ও অস্থির দুনিয়ায় কীভাবে নিজেকে এবং ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবে এই

চিন্তায় তাড়িত হয়ে গোটা ভারতের এক প্রান্ত থেকে ছুটে বেড়ায় অন্য প্রান্তে। কিন্তু কোথাও কোনো বেঁচে থাকার সংস্থান খুঁজে পায় না। ফলে জটি হয়ে যায় ঠাকুরানি। সে শুধুমাত্র সাঁঝে আর সকালে সাধনের মা, আর সারাদিন জটি ঠাকুরানি। গ্রামের মানুষ তাকে সারাদিন ধরে পূজা দেয়, সিঁদুর পরায় আর বিনিময়ে জটি পায় একপালি চাল। যা দিয়ে জটি তাঁর সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেন। এ মায়ের আর এক রূপ। শুধুমাত্র অন্নের অভাবেই যে জটি ঠাকুরানি হয় তা নয়। বর্বর সমাজের কলুষিত, কলঙ্কিত, লোকদের দৃষ্টি পরে সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রিত স্বাস্থ্যতী, সুঠাম, সৌন্দর্যময়ী, রূপবতী, সদ্য যৌবনা প্রাপ্ত জটির উপর। তাইতো সন্ন্যাসীর পরামর্শে জটি হয়ে যায় ঠাকুরানি।

> "লাল চেলি আর একটা ছোট ত্রিশূল দিয়েছিল সন্নেসী। বলেছিল, একদিন তোকে শেয়ালে শকুনে ছিড়ে খাবে তা মনে জানতে পারছি। তবু তুই এই বস্তরে – অস্তরে চলে যা মা। এ ঘর কলিতেও যার কেলাসে সাধু সন্নেসী চলে যেতে পারে, কেউ মাথায় পা দেয় না।"[৩০]

সন্ন্যাসীর বক্তব্যের মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতা যেন গোটা ভারতবর্ষের চিত্রটাকেই তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষ নামক দেশটির ধর্মান্ধ চেহারাটিকে তুলে ধরাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মকে যেমন রাজনীতির, নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করা যায়, ঠিক তেমনি সময় বিশেষে ধর্ম হয়ে উঠতে পারে নিরাশ্রয়দের আশ্রয় স্থল। একটিমাত্র লাল কাপড়ের আড়ালে ভ্রষ্টাচারের মুখোশকে লুকিয়ে রাখা যায় তাই সন্ন্যাসী জটিকে নিজের অসহায়তা ঢাকার সহজ পথটিকে বলেদিয়েছিল। এই বিপাকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই জটি ঠাকুরানির রূপ ধারণ করে। এবং সত্যিই জটিকে ঠাকুরানির রূপে দেখে কেউ আর কিছু বলার সাহস করেনি। ওর রূপ, রাঙা কাপড়, পিঠের পোটলায় ছেলে, হাতে ত্রিশূল দেখে সবাই অবাক হয়। জটি মানুষের অত্যাচার, ধর্ষন ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হয়ে ওঠে ঠাকুরানি। ট্রেনে চলা কালীন জটি,

> "জানালা দিয়ে চেয়ে ছিল বাইরের দিকে। দুই চোখ ভেসে যাচ্ছিল ওর এইতো মানুষ ওকে মান্যদিল, সমীহ করল। এরই নামকি জাতে ওঠা? আহা উৎসব যদি থাকত, তবে দেখতে পেত কাছাড়ি নয়, আদালত নয়, শুধু একখানা কাপড় আর ত্রিশূলের জোরে জটি কেমন জাতে উঠে গিয়েছে।"[৩১]

আত্ম রক্ষার জন্য কখনো কখনো বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয়। উৎসব জীবন যুদ্ধে হেরে গেলেও জটি অত সহজে হার মানার মানুষ নয়। কেননা সে ভব ঘুরে যাযাবর সম্প্রদায়ের কন্যা। অভাব অনটন যেন এদের রক্তেই প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাইতো স্টেশন থেকে নিয়ে আসা ট্রেনে গান গাওয়া হরিনাম কীর্তন করা লোকটি তাকে কুপ্রস্তাব দিলে জটি এর প্রতিবাদ করতে পেরেছে,

> "জানু আমি কে? কুনসমাজের মিয়্যে? জানু মোর বাপকে, মা কে, গাঁতি-জ্ঞেয়াতি আঁতের মনিষ কে? তু আমায় কু প্রস্তাব করিস? বাণ মেরে ফেলাব না !"[৩২]

জটি বুঝতে পেরেছিল সংকট অতিসন্মুখেই বিরাজমান, নিজেকে আর কত দু:শ্চরিত্র পুরুষের হাত থেকে রক্ষা করবে ! চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই লোলুপ শকুনের দল ছিড়ে খাওয়ার জন্য। সুতরাং অলৌকিকতা দিয়ে নিজেকে মুড়িয়ে না নিলে আর রক্ষা নেই কেননা 'সুন্দর মুখের মরণ!' তাইতো জটি হয়ে ওঠে ঠাকুরানি অর্থাৎ ঈশ্বরী, আর সাঁঝে সকালে 'মা'। এখানে লক্ষনীয় ধর্মের অনুষঙ্গেই বিশ্বাস, ঈশ্বর, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি আসে। এই ধর্ম তন্ত্রই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কলঙ্ক ঢাকতে ব্যবহৃত হয়। তাই কখনো কালো পাথরের ঠাই (মাজার-লালসালু) তো কখনো একটুকরো লাল কাপড় জটির নিয়ন্ত্রনের প্রতীক হয়ে ওঠে। জটির যৌবনদীপ্ত স্বাভাবিকতাকে, সতীত্বকে এবং পবিত্রতা কে রক্ষা করতেই লাল কাপরের ঈশ্বরত্বকে গ্রহন করতে হয়েছিল। অপরদিকে জটির

একমাত্র সন্তানও বুদ্ধিহীন জীবন যাপনে অভ্যস্থ। সে কিছু জানেও না বুঝেও না। সমাজেরনিম্ন স্তরে বসবাসকারী অসহায় মায়ের উপর নির্ভরশীল ত্রিশ বৎসরের শিশু,

> "মা ছাড়া সাধন কান্দোরী কিছু জানে। সাধন নির্বোধ, ত্রিশ বছর বয়সেও ওর বুদ্ধি সুদ্ধি অপরিনত। মোষের মতো শরীরে ওর পাকস্থলী ছাড়া আর কিছু নেই। ফুসফুস রক্ত জবার পাঁপড়ির মতো হৃদযন্ত্র, সাপের মতো পিচ্ছিল নাড়ী, ভোরের দোপাটির মতো কুসুম কোমল জীবকোষ কিছু নেই ওর শরীরে। শুধু একটা পাকস্থলী আছে। আর আছে খিদে। শুধু খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে ওকে দিয়ে ওর মুনিবের যুবতি বউ কাঠ চ্যালা কুড়ায়, টিউব কলের জল টানায়। মন মন কয়লা ভাঙিয়ে নেয়।"[৩৩]

ভাত, ভাতের গন্ধ, পেটের খিদে আর এই জগৎ চরাচরে শুধুমাত্র মাকে ছাড়া সাধন আর কাউকে চিনে না। পৃথিবীতে তার যেন এই তিনটি জিনিস ছাড়া আর কোন কিছুরই কোন প্রয়োজন নেই। তাইতো জটি সন্তানের পেটের জ্বালা মিটানোর জন্য 'অনাদির মতো পাপি তাপি দের জন্য আঁতুরের মরা ছেলের নখ, গোসাপের কণ্ঠহাড়, ধনেশ পাখির তেল,সংগ্রহ করবে? পয়সা নয়, কড়ি নয়, শুধুমাত্র একপালি চাল নিত জটি ঠাকুরানি। সন্ধ্যা হলে ঠাকুরানি হয়ে যেত সাধনের মা। ঠাকুরানি হয়ে যে চাল পেত, মা হয়ে তার ভাত রেঁধে ওর হাবা ছেলেকে খাওয়াত।'[৩৪]

এখানে জটির মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতা যেন এক অভাগিনী মায়ের মাতৃত্বকে, মমতাকে,বাৎসল্যকে গভীরতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। সে ঠাকুরানি হয়ে যা সংগ্রহ করেছে তার সবটাই নিজের সন্তানকে খাইয়েছে। কিন্তু নিজে ছিল অনাহারে। এই অনাহার জীবন যাপনের ফলেই জটি ঠাকুরানি আত্মস্থ হয়ে পরে। তাকে হাস পাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তার জটির কোন রোগ চিহ্নিত করতে পারেনা। সাধনের বিশ্বাস সে নিজেই ঈশ্বর,

তার কোন রোগ হতে পারে না। কেননা ঈশ্বরের দ্বারাই রোগ নিরাময় হয়। সত্যিই জটির কোন রোগ হয়নি। আর যা হয়েছে তা তার একার নয়, গোটাভারততথাবিশ্বেইএইরোগছেয়েগেছেএএকএমনই অদ্ভুত রোগ। গল্পকারের শ্লেষদীর্ণ বাচনে তাই যেন ঝলসে ওঠে,

> "তিন দিনের দিন ডাক্তার জটির রোগ ধরতে পারল। জটির রোগ বড় ছোঁয়াচে। আজও ভারত ভূমিতে তার চিকিৎসা বেরোয় নি কোন। এরোগের নাম অনাহার। না খেয়ে না খেয়ে খুঁদ কুড়ো সাধনকে খাইয়ে জটি ঠাকুরনির নাড়ী শুকিয়ে গিয়ে ছিল।"[৩৫]

অথচ একুশ কোটি মানুষের মজবুত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বের বৃহত্তম গনতান্ত্রিক ও তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ ভারতবর্ষ। বহু গর্বে গর্বিত এই দেশ। অথচ এত গর্বের মধ্যেও এই মাতৃভূমিতে মেয়ে হয়ে জন্ম গ্রহন করা পাপ, মায়েদের অনাহারক্লিষ্ট রোগে মৃত্যু বরণ করতে হয়। মহাশ্বেতা জটির 'অনাহার' নামক রোগের মধ্যদিয়ে শুধু সাধনকেই নয় গোটা ভারতবর্ষের অনাহার ক্লিষ্ট বুভুক্ষু মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন।

জটিকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, তাকে ঘিরে পাড়া প্রতিবেশির ভীড় ঠাকুরনি বাড়িতে এসেছে। সে স্বর্গে যাবে। দিনের বেলা যেহেতু জটি ঠাকুরনি তাই সে এখন সাধনের মা নয়। সে ঈশ্বরী। এই মুহুর্তের বর্ণনাটি লেখিকা নিজেই দিয়েছেন,

> "সকলের মনে মহা কৌতুহল। সাধনের মাটির উঠোনে পাড়া পরশির ভিড়।যেন একঅন্ত্যজ, গরীব হতভাগিনী মারা

যাচ্ছে না, যেন কোন মহামানী দামি মানুষ মারা যাচ্ছে তাই এত ভিড়।

সবাই চুপ করল। নিশ্বাস টানল। কী চাইবে তাদের জটি ঠাকুরনি শেষ সময়ে।

'সাঁঝে মরতাম বিয়েনে মরতাম, তুর কানাকড়ি লাগত না। এ্যাখুন তু মোকে হাতি দিবি। ছরাদে হাতি দিবি।'

'কিরে কাড়লাম।'

শোকে দু:খে পাগল, ঘটনার অস্বাভাবিকতায় হতবুদ্ধি সাধন বলল 'সভে শুন উনির ছরাদে আমি হাতি দান করব।'

'ঘো.....ঘো.....ঘো.....ঘোড়া দিবি।'

'দিব'

'অন্ন – বস্ত – ভুঁই – সোনা – উপো অযচ্ছল দিবি।'

'দিব'

সাধন ডুকরে কেঁদে উঠল 'সব দিব গো ! তুমি মোড়ে ছেরে যেয়ো না।মোর ক্যাও লাই!''[৩৬]

জটি মারা যায়, শ্রাদ্ধের জন্য অনেক খরচ না করলেও চলে। সামান্য খরচেও হাতি, ঘোড়া, সোনার গাভী, ভূমি দান করা চলে। তাই করল সাধন, কালী ঘাটের বামনকে আঠারো টাকা ধরিয়ে দিয়ে সাধন তার মায়ের শেষ শ্রাদ্ধ টুকু সম্পন্ন করল। শ্রাদ্ধের জন্য যে চাল নতুন গামছা দেওয়া হয় তা পুরোহিতের প্রাপ্য। কিন্তু সাধন সমস্ত কিছু পুরোহিতকে দান করলেও একপালি চাল সে দান করবে না। কেননা একপালি চালের থেকে কয়েকটি চালমাত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার মায়ের শ্রাদ্ধান্নের জন্য। বাকি চাল সে পুরোহিতকে দিবে না। সাধন গামছার কোনে চাল বেঁধে নিয়ে পালাতে থাকে এবং বন্ধু বলরামকে বলে,

> "বলরাম! চাল আমার! আমার পাছু আছিস না। পুরুত নিস্ফল আক্রোশে বলল শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে রেঁধে খাওয়া। এ শ্রাদ্ধ তোর নষ্ট হল ব্যাটা।কেন নষ্ট হবে, আমি হাতি দিই নাই? গরু দিই নাই? সোনা রূপা – বস্তু দিই নাই? কোন শালা আমার মায়ের ছরাত নষ্ট করে শুনি? বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলেদুলে বাড়ি যায়, সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত রাধবে। ভাতের গন্ধ বড়ো ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাধবে সাধন, তপ্তভাত খাবে, ততদিন ওরকাছে সাঁঝ সকালের মা বাঁধা থাকবে। মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দূর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।"[৩৭]

মহাশ্বেতা দেবী 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে যেন দেখাতে চেয়েছেন মা নামক শব্দটিকে কত জটিলতা ঘিরে রাখে। সন্তানের জন্য মাকে ঈশ্বরী সাজতে হয়, কখনো পতিতা হতে হয়। তবুও যে মা। জটির জয় পরাজয়ের চেয়েও বড় হল সারা জীবন ধরে দরিদ্রতা নামক সামাজিক ব্যধির বিরূদ্ধে লড়ে যাওয়া, সে সঙ্গে লৈঙ্গিক পরিচয়ে 'নারী' হওয়ার জন্য তার জীবন যুদ্ধের জটিলতার আরও এক মাত্রা যোগ হয়েছে। একজন নারীর প্রতিবাদের মাধ্যম গুলি কী হতে পারে। এই প্রতিবাদ লক্ষ করি জটি ঠাকুরাণীর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি পদে পদে। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তাকে লড়তে হয় পশুর মতো পুরুষদের বিরুদ্ধে, তাদের জৈবিক লালসার বিরুদ্ধে এবং আর একবার প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নামতে হয় অভাবের বিরুদ্ধে। জটি এই দুই দিকের লড়াইয়ে জয় লাভ করেছে। নিজে জীবনের লড়াইয়ে হেরে গেলেও সে যেন তার ছেলে সাধনের মধ্যদিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রতিবাদের বীজ বপন করে গেছে। অবচেতনভাবে হলেও সাধন কালী ঘাটের ব্রাহ্মনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে লড়াই করেছে তার নিজের অধিকারের জন্য। তাই তো সাধনের লড়াইকে আমরা শুধুমাত্র অন্নের ও অভাবের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ রাখতে পারিনা। কেননা সাধন শুধু মাত্র তার

মায়ের স্মৃতি এবং নিজের ক্ষুধার জন্যই নয় একই সঙ্গে লড়াই করেছে বিধান সৃষ্টিকারী ব্রাহ্মন তন্ত্রের সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিরুদ্ধেও। এবং অবশ্যই পরোক্ষভাবে যেন এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছে জটি ঠাকুরানী।

‘যমুনাবতীর মা’

প্রথম প্রকাশ : ‘পরিচয়’ (১৩৭৯/১৯৭২) খ্রী.

‘যমুনাবতীর মা’ গল্পে মহাশ্বেতা একজন মায়ের নিজের সন্তানের প্রতি মায়া মমতা, করুনা, স্নেহ ভালো বাসা এবং সর্বোপরি তার সমস্ত স্বপ্নের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাকে প্রকাশ করেছেন। এই গল্পে দরিদ্রসীমার একে বারে নীচে বসবাসকারী শ্রেণির মানুষরাই উঠে এসেছে। যমুনাবতী, তার মা এবং তার বাবা এই নিয়ে এদের সংসার। বাবা ঔষধের

দোকানের বোতল ধোয়ার কাজ করে এবং যমুনা বতীর মা শহরের দোকানে দোকানে ধূপকাঠি বিক্রি করে সংসার চালায়। এছাড়াও রাত্রে যমুনাবতীর মা কাগজের প্যাকেট তৈরী করে ও সুপারি কাটে যা দিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করার চেষ্টা করে। কিন্তু অভাবের তাড়নায় অতিরিক্ত কোনকিছুই হয় না। মেয়েটির নাম যমুনাবতী খুব সুন্দর কাব্যিক নাম। অথচ এই নামের সঙ্গে বাস্তবে যমুনাবতীর কোন মিল নেই দরিদ্র পরিবারের এই মেয়েটি একেবারে রোগা, গায়ের রং মেটে, পাতলা কোকড়া চুল। এই মেয়ের শরীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাশ্বেতা নিজেই বলেছেন,

> "দেখেই বোঝা যায় এক সময় ওদের প্রয়োজন থাকলেও এখন, এই সব অঙ্ক মিলে যাওয়ার সময়, ওরা ফালতু এখন ওদের ফেলে দেওয়া দরকার। ওরা আছে বলেই ফারাক্কার জল হুগলিতে আসে না, সি. এম. ডি. এ শহরটা সুন্দর করতে পারছে না, প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠতে পারছে না। ওদের মতো কয়েক লক্ষ মানুষকে এখনই ফেলে দেওয়া দরকার, তা হলেই এই দেশ, এই শহর সুন্দর হবে। শত শত সিদ্ধান্ত আর লক্ষ লক্ষ প্রতিশ্রুতি রাখা যাবে। ওরা সার্থকতার পথে একটা অবাঞ্চিত জঞ্জাল। ওর বাপ মা সে কথা জানে না। তাই ওরা মেয়ে টাকে খুব ভালোবাসে। বোধয় নিজেদেরও ভালো বাসে।"[৩৮]

মহাশ্বেতা যা বলেছেন তার অন্তরালে আরও কিছু রয়েছে না বলা কথা। বোধহয় উঁচু নিচুঁ বর্ণ বৈষম্যের কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন লেখিকা। রাজনৈতিক নেতাদের এবং উচ্চ পদস্থকর্মী দের শুধুমাত্র ভোট গ্রহন করার সময় কার প্রতিশ্রুতি এবং পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতি কোন দৃষ্টি, কল্যানকর কোন পদ্ধতি অবলম্বন না করার দিক গুলিকে তুলে ধরেন মহাশ্বেতা। কেননা সমাজ সংস্কৃতিতে এখনও এই শ্রেণির মানুষের কোন অভাব হয় নাযারা সংবিধান বোঝে না, রাজনীতি বোঝে না। যাদের শিক্ষা নেই সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পরা শ্রেণির জন্য কোন সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র নেই। অথচ দিন দুপুরে স্বপ্ন দেখার

অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে স্বপ্ন কোনদিন সত্যি হয় না। এই শ্রেণির মানুষের কোন স্বাদ নেই, আহ্লাদ নেই। এরা ইচ্ছে করলেও নিজের বাঁচার জন্য একটি খেলনা ক্রয় করতে পারে না। বাঁচার জন্য একটি জামা ক্রয় করার জন্যও কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। কেননা এই শ্রেণির মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। নিজের কায়িক পরিশ্রমের মূল্যদিয়ে পেটের খোড়াক যোগানোই মুস্কিল হয়ে যায়। তাই তো যমুনাবতীর মা যমুনাবতীর জন্য একটি পুতুল কেনার স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নে বলে,-

> "ওর ভাড়ে টাকা জমেছে। ও ওই পুতুলটা যমুনাবতীকে কিনে দিয়েছে। মেয়ের বাপ বলেছে 'সোমসারে ও টাকাটা একটা বল ভরসা। তুমি পুতুল কিনলে তা দিয়ে ? পুতুল কিনলুম। খুব তেজের সঙ্গে জবাব দিচ্ছে যমুনাবতীর মা। আরও কত কথা স্বপ্নেই মনে হচ্ছে ওর। এই দোরে দোরে ঘুরে ধূপকাটি বিক্রি করা, এই কষ্ট এ কেন বাপু ? তুমি একটা যোগ্য মানুষ নও, সে জন্যই তো ? কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেও সত্যি কথা গুলো লোকটাকে বলতে পারছে না। লোকটা এমন ভীতু, রোগা, মার খাওয়া। জেগে ভেবেছে ওই পুতুলটাই কিনবে। ঠোঙা বেচা পয়সায় কিনবে। সেই জন্যই ও যেতে আসতে মেয়েটাকে বলেছে ওই দেখ মা। আর কদিন যাক, কিনে দোব।"[৩৯]

যমুনাবতীর মায়েরা ঘরে ঘরে সুগন্ধী আলো পৌঁছে দেয় কিন্তু নিজেরা সব সময়েই গভীর অন্ধকারেই থাকে। তাদের কাছে দুমুঠো ভাতের সন্ধান ছাড়া শিশুর শৈসবে সব উপকরনই বাহুল্য। কেননা এদের ঠিকানায় শৈশব কৈশোরে প্রবেশের আগেই তার দ্বাররুদ্ধ করে দরিদ্রতা, ব্যধি, মৃত্যুর মতো বিভীষিকা। তাই এই স্বপ্ন যমুনাবতীর মা'র স্মরণ হয় না। কেননা সন্তান অসুস্থ হয়ে পরে। এবং চিকিৎসার জন্য শেষ সম্বল ঐ ঠোঙা বেঁচা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়। এভাবে একের পর এক সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় যমুনাবতীর মা'র। এভাবে আবার স্বপ্ন দেখে একটি জামা কিনে দেওয়ার কিন্তু তাদের সে স্বপ্নও স্মরণ

হয় যমুনাবতী আরও বড় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে এস্বপ্নও সত্যি হয় না। তাইতো যমুনাবতীর মা স্বপ্নের স্বাধীনতাকে স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পারিদেয় কঠোর বাস্তবতায়। তাই দু:সাহসিক স্বপ্ন দেখে যমুনাবতীর মা,

> "এই শহরে ওরা ফালতু অবাঞ্চিত নয়। শহরের ভীড়ে সবাই যখন ট্যাক্সি চড়ে, তখন ওরা তিনজন পা টেনে টেনে হাটে না। ওরাও ট্যাক্সিচড়ে। ওরাও আলোর নিচে দিয়ে হাটে। এই স্বপ্নটায় যমুনাবতীর পরনে লাল জামাটা থাকে। ওর মা বাবার গায়ে কি সুন্দর জামা-কাপড় ঝলমল করে। সব দোকানে কেনা। ফুটপাতের আধা অন্ধকার থেকে দের টাকা-সাড়েতিন টাকা-আড়াই টাকা নিলামে কেনা জামা কাপড় নয়।"[৪০]

শুধুমাত্র স্বপ্ন দেখার জন্য যারা পৃথিবীতে আসে তারা শুধু স্বপ্ন দেখেই যায় কেননা বাস্তবে এদের কোন স্বপ্ন পুরণ হবার নয়। একই সমাজে একদিকে বসবাসকারী মানুষ ড্রিম হাউসে ঘরে বসে, শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে রাজ ভোগ গ্রহন করে, রাজমহলে বসবাস করে সুখ সাচ্ছন্দ বিলাসিতার জীবন যাপন করে।আর অন্যদিকে সমাজের নীচু তলার মানুষেরা শুধুমাত্র দুবেলা খাবার আর একটা নতুন কাপড় কেনার মতো পরিস্থিতি টুকু থাকে না স্বপ্নের জগৎ ছাড়া। এই বৈসাদৃশ্য চেহারাই আমাদের সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি। একারনেই বোধহয় যমুনাবতীর মা নিজের চাহিদা পুরণের মাধ্যম হিসেবে বেচে নেয় স্বপ্নকে। যেখানে কোনো টাকা লাগে না, পরিশ্রম লাগে না, লাগে শুধুমাত্র ভাবনা। কিন্তু ভাবনা টুকুর মধ্যে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ নির্মিত ব্যাধি। এই ব্যাধির শিকার যমুনাবতী সে আবার শারীরিক ভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর পড়েবে না কেন,সমাজের বৈষম্যের দীনতাকে যে ওদেরই বহন করতে হয়।

> "ওর মতো বাচ্চাদের সকাল থেকে রাত অব্দি দুধ ডিম, মাখন, মাছ, দই, আপেল, কলা, মাংস,সবজি আরো কত

কি। তা না খেলে শরীরে পুষ্টি হয় না। ওর হয়নি। কোলে নিলে বোঝা যায় ওর ওজন কত কম ? ওর চোখ দেখে বোঝা যায় ও কত নির্জীব?”[৪১]

মহাশ্বেতা যমুনাবতীর বাবার মুখদিয়ে যেন শুধু মাত্র যমুনাবতীর চেহারার বর্ণনা দেননি। গোটা ভারতবর্ষের এই দরিদ্র শ্রেণির মানুষের আসল চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন। অভাব শুধু মাত্র এদের পোশাকের দীনতায় নয় এদের চেহারাতেও অভাব পরিলক্ষিত হয়। পুষ্টি কি জিনিস তা এদের শরীর জানে না। দুধ, ডিম, মাছ, দই, কলা, মাংস, এসবের ভিটামিন এরা কখনো পায় না। তাইতো এদের মধ্যে চেহারার উন্নতি লক্ষ করা যায় না। দিন দিন অবনতি ছাড়া। শুধু যে শিশুরাই পুষ্টির অভাবে দিন যাপন করে তা নয়। এদের মাতাপিতা সকলেই এই অপুষ্টির শিকার। তাই রাখালি মুখ অন্ধকার করে প্রকৃত সত্য কথাটিকে উপস্থাপন করেন, ‘মা বাপ রোগা রোগা, মেয়ে কী থুম থুমে মোটা হবে।’ অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় এরা যে দরিদ্র সে কথাই ব্যক্ত হয় রাখালীর মধ্যদিয়ে।যমুনাবতীর নামটি রেখেছে রাখালি। সে গানগাইতো যমুনাবতীর নামে। এবং এই গানের নাম অনুসারে মেয়েটির নাম রাখা হয় যমুনাবতী।

“যমুনাবতী সরস্বতী ভায়েবোনে ভাগ্যবতীবকুল গাছে সোঁদাল ফুলটি টাপুর টুপুর করে।”[৪২]

কিন্তু এই নামের, এই গানের কোন মানেই এদের মতো সংসারে থাকে না। কেননা যমুনাবতী এই জটিল অপুষ্টিকর পরিবেশকে ত্যাগ করেছে। এখন আর যমুনাবতীর বাটের দরকার নেই, দরকার রয়েছে ঘাটের। এই শ্রেণির মানুষেরা সমাজের উঁচু শ্রেণির সাংস্কৃতিক রাজনীতির কৌশলের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না। কেননা সে শিক্ষা এদের সমাজ দেয় না। সমাজ এদের শিক্ষা দেয় কষ্ট করতে, কাজ করতে, অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে। এটাকেই যেন তারা জীবনের প্রাপ্তিবলে মেনে নেয়। এই অসম শিক্ষা সমাজই তাদের জন্য চালু করেছে। তাইতো সম্পূর্ণ কায়িক শক্তি খরচ করে এরা শুধুমাত্র একবেলা

অনাহারেই সন্তুষ্ট থাকে। লেখক লেখক স্বর এদের কথাই তুলে ধরেন কিছুটা ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে,

> "এখন ওর চোখে প্রশ্ন নেই রাগ নেই হিংসে নেই। ওর চোখ কান্নায় ফোলা, লাল জবা, বিস্মিত, অস্বস্তিকর ভয় জাগানো। এখন ওর চোখে বিস্ময়, অনন্ত অপার বিস্ময়। এখন ও বুঝতে পেরেছে ওকে, ওর মতো মানুষ গুলোকে ফেলে দিতে না পারলে এ শহরের, এ দেশের মুক্তি নেই। সকলের, সব প্রতিশ্রুতির পথে ওরা বাধা, জঞ্জাল।.....
>
> এখন ওকে আর ফালতু মনে হয় না। দরকারীও,মনে হয় না।
>
> অসম্ভব অচেনা-অচেনা ভয়াবহ দেখায় ওকে, কেননা এ মহাতীর্থে এই সকালে, এখনই, ও নিজের বিষয়ে, নিজের মতো লোকদের বিষয়ে সব কথা জেনে গেল। এখন মনে হয় ওকে, ওর মতো মানুষ গুলোকে ফেলে দিতে না পারলে এ শহর এ জীবন, এ দেশ, কিছুই সুন্দর হবে না। ওরা আছে বলেই সকলের কাজের পথে এত বাধা। মনে হয় ওর মতো,মানুষ গুলোর জন্যে এখনি কোন জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এত বৈজ্ঞানিক, এত পরিকল্পনা, এত গ্যাস, এত চেম্বার,ব্যবস্থা কি হয় না?"[৪৩]

তীব্র তাচ্ছিল্যের সুরে মহাশ্বেতা যেন সমাজ নিয়ন্তাদের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেও কি একটি দেশকে তার দারিদ্রতার, লাঞ্ছনার দৃশ্য ঢাকতে মৃত্যু কামনা করতে হবে। এ ঠিক প্রশ্ন নয় লেখকের স্বগতোক্তি যেন, কিন্তু আমাদের কাছে প্রশ্ন হয়েই থেকে যায়।

‘হারুন সালেমের মাসি’

প্রথম প্রকাশ : ‘কথাসাহিত্য’ ১৩৭৮/১৯৭১ খ্রী.

মহাশ্বেতার মা সিরিজের গল্পগুলিতে যে মায়ের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায় তার প্রত্যেকটি মা চরিত্রই প্রান্তিকায়িত। সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, সম্পর্ক এবং মায়ের অধিকার প্রভৃতি বিষয় গুলি থেকে পরিপূর্ণভাবেই বঞ্চিত, অবহেলিত, নৈরাশ্য পীড়িত এবং হতাশাদীর্ণ। এরকম আর একজন হতাশাপূর্ণ, মা চরিত্র লক্ষ করি হারুন সালেমের মাসি গল্পের গৌরবীর মধ্যে। গৌরবী নিজেই স্বামীর মৃত্যুর পর একাকিত্ব জীবন যাপন করে। সন্তান তাকে বিতাড়িত করেছে। তার থাকার ঘর নেই। স্বাভাবিক ভাবে সন্তানের বিয়ে হলে ছেলে পর হয়ে যায় বৌমা ঘরে থাকতে দেয় না শাশুড়ি সম্পর্কে এমন একটা ধারনা রয়েছে সমাজে কিন্তু গৌরবীর ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টোটা। তার ছেলেই তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। 'সে নিজে বিয়ে করতে না করতে মাকে ভাত দিতে অস্বীকার করল।' অপরদিকে মুকুন্দ গৌরবীকে তার নিজের জমিতে থাকার ব্যবস্থা করেদিল। তবে মুকুন্দ যে শুধুমাত্র গৌরবীর দু:খ কষ্ট দেখেই তাকে বাড়িকরে থাকতে দেয় এমনটা নয়। এখানে মুকুন্দেরও স্বার্থ রয়েছে। কেননা একদিকে রাজনৈতিক দাঙ্গার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা অপরদিকে জমির মূল্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাই যদি এখানে গৌরবী থাকে তাহলে এই জমি কেউ দখলদারি করতে পারবে না এই হল মুকুন্দের রাজনৈতিক চাল। যাইহোক নারকেলের পাতা চেঁছে, শাক, গুগলি, জগডুমুরের ডাল, থানকুনি পাতা, মেটে আলু প্রভৃতি দিয়েই দু:খে কষ্টে চলে গৌরবীর একাকিত্বের সংসার।

একদিকে নিজের সন্তানের দ্বারা বিতাড়িত মা আবার অন্যদিকে বিধর্মী মাতৃহারা সন্তানকে আশ্রয় দানের জন্য সদা জাগ্রত মাতৃহৃদয়; আবার স্নেহময়ী মায়ের করুনা, মায়া মমতা এবং নিজের বিবেক বোধকে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন ঐ চরিত্রের মধ্যদিয়ে। হারান সাত বছরের শিশু সন্তান। তার মা তাকে রেখে মৃত্যু বরণ করেছে শুধুমাত্র গৌরবীর ভরসায়। পারিবাড়িক অবস্থার দিক থেকে হারার মায়ের অবস্থা যে খুব ভালোছিল তা নয়। সে আরও বেশি দরিদ্র ছিল। এদের নিজের বলতে কেউ ছিল না। হারার মার,

> "ছেঁড়া কাপড় গেরোদিয়ে পরা, রোগা ছিপ ছিপে মানুষ, এক
> মাথা রুক্ষ চুল। চুলের বাহার খুব। কোঁকড়া ফুর ফুরে, গলায়

একটা মাদুলি ছাড়া গয়না নেই। দু:খির দু:খি, দরিদ্রের দরিদ্র।”[৪৪]

গৌরবীর সঙ্গে হারার মা’র দরিদ্রতার দিক থেকে প্রতিযোগিতা করলে কেউ কারো থেকে কম হবে না। কিন্তু অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে গেলেও সমাজের ধর্মীয় গোড়ামির কোনো ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। এই হল সমাজের বসবাসকারী নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চশ্রেণির মানুষের এক বড় ধরনের সমস্যা। তাইতো গৌরবী হারাকে নিয়ে পরে যায় সমস্যায় কেননা হারা না তো তাদের ধর্মের মানুষ নাতো তাদের সমাজের। মহাশ্বেতা সমাজের ধর্মীয় বর্বরতার একঘেয়ে সামাজিক বিধিবিধানের দিকটিকেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন। পেটে ভাত শরীরে কাপড় থাক বা না থাক এটা বড় কথা নয় সমাজে ওরা মুসলমান তাই তারা হিন্দুধর্মের মানুষের ঘরে থাকতে পারবে না। তাদের হাড়িতে ভাত খেতে পারবে না, তাদের থালিতে ছোঁয়া যাবে না, তাদের ঘরে ঢোকানো যাবে না। কেননা ওরা ভিন্নধর্মী। তাই ওরা চির জীবন হিন্দু ব্রাহ্মন ধর্মের কাছে ছোট জাতের মানুষ হয়েই বসবাস করবে। এই হল হিন্দু ধর্মের একটি বাস্তবিক রূপ। মহাশ্বেতা বোধহয় এই রূপটিকে দেখানোর প্রয়াস করেছেন। তাইতো হারাকে নিজের বাড়িতে ঠাই দেওয়ার জন্য গৌরবী চিন্তিত হয়ে পরে এবং যশিকে সে কথা অত্যন্ত ভীতু হয়ে বলে,

“ওর মা তো মরে গেল। ছেলেটা এখানেই ঘোরে যশি, দুটো ভাত খায়, উঠানে ঘুমায়।’ যশি বলে, ‘ঘরে দোরে উঠে বসে নাতো ? দেখ বাবা, ছোঁয়া নেপায় একাক্কার করো না।’ ‘নানা, উঠানে থাকে। ওরই সানকিতে খায়, আমি উপর থেকে ভাত দিই।”[৪৫]

তবে ধর্মীয় ভেদাভেদ যাই হোক না কেন এই সমাজের নারীরা পরিপূর্ণভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। কেন এই শ্রেণির নারীরা নিজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস তারা নিজেরাই যেমন সংগ্রহ করে, কারো উপর নির্ভরশীল নয় আবার নিজের

পরিবারকেও নিজেরাই চালিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কেননা এরা অনেকেই পুরুষের থেকেও অধিক পরিমানে পরিশ্রম করে থাকে। হারুন সালেমের মাসি গল্পের এরকমই একটি নারী চরিত্র যশি।লেখিকার বর্ণনায়,

> "বিকেলে যশি উঠোনে বসল। যাওয়ার সময় ছুটে ছুটে যায় যশি। ওদের পুরুষরা কোনদিন ভাত কাপড় দেয় না, যশির বরও দেয় না। ওদের মেয়েরা আশা করে না পুরুষরা ভাত কাপড় দিবে, যশিও করেনা। যশিরা শরীরে খেটে সংসার বেধে তোলে ছেলে পিলেকে জন্তুর মতো জাপটে ভালোবাসে আর স্বামীদের খুব তোয়াজ করে ভূলিয়ে রাখে।"[৪৬]

যাইহোক কর্ম নিপুনতার মধ্যে স্বার্থকতা থাকলেও জাতপাতের বিচারে এরা একেবারেই অনুন্নত। তাইতো যশি গৌরবীকে না করে দিল হারাকে তার নিজের বাড়িতে রাখতে। অপরদিকে সন্তান নিবারণ এখন অবস্থাশালী হয়ে গেছে, তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিবর্তন হলেও মানসিক দিক থেকে সেই পশুত্ব এখনও রয়েছে। কেননা সমাজে একটা নাম পেয়েছে নিবারণ তার একটা পরিচয় হয়েছে। তাই সেদিক বিচার করে গৌরবীকে রাখা যায় নিজের বাড়িতে কিন্তু আপদ হারাকে না সরালে সে বিষয় নিয়ে ভাবতে রাজি নয় নিবারণ। তাইতো সে সেই পাপ হারাকে বিদায় দিতে খানিকটা শাসায়ও নিবারন তার মা'কে।সমাজ গৌরবীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে হারাকে নিজের বাড়িতে ঠাই দেবার জন্য। কেননা শেষ আশ্রয়দাঁতা মুকুন্দও সেই বাড়ি ছেড়েদিতে বলে যদি সেই মুসল মানের সন্তান হারাকে সে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হয়।

এই জটিল দুনিয়ায় হারার মতো অসহায় মাতৃপিতৃহীন, আশ্রয়হীন শিশু সন্তানদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এরা বেঁচে থাকলেও কেউ এদের হিসেব রাখে না আবার মরে গেলেও এদের হিসেব কেউ রাখেনা। তাইতো নিবারণ বলতে পারল হারার কথা,

> "মনে পড়ে, বহুকালে চলে এলাম। দেশ ভাগ তো তার পরে হলরে !সেখানকার মানুষও আসছে কত !ওখানে ওকে ওরা যেতে দেবে ?ফেলে তো দিয়ে আসি। তা বাদে পেলে খাবে, না পেলে না খাবে। মরলে মরবে। রোজদিন হেথা হোথা মানুষ মরছে না ! ওর কপালে থাকলে মরবে।"[৪৭]

গৌরবীর মাতৃত্ব, মানবিকতা, বাৎসল্য আরও গভীর থেকে গভীরে পৌঁছায়। একটি দুধের বালককে সমাজ বঞ্চিত করলেও গৌরবী তা করতে পারেনি। কেননা তার মাতৃ হৃদয় তাকে বাঁধা দিয়েছে। তাই তো মানব সত্তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা পশু প্রবৃত্তি তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। গৌরবী সমাজ ছাড়বে তবু এই দুধের বালককে ছাড়তে পারবে না, ধর্ম ছাড়বে, নিজের সন্তান ত্যাগ করবে, নাতি পুতির মায়ামমতা সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দেবে তবুও মানবিকতাকে কখনও কলঙ্কিত করতে পারেনি।তাই সমাজ সংস্কারের ধর্মীয় গোড়ামি, সম্পর্কের বন্ধন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ককে ছিন্নকরে হারাকে সঙ্গে নিয়ে পারি দেয় অনেক দূরে। যেখানে সমাজ থাকবে না, ধর্ম থাকবে না, নিষ্পাপ–নিস্কলঙ্ক শিশু হারার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কোন বেড়া জাল থাকবে না সেই স্থানে গৌরবী পালিয়ে যায় হারাকে নিয়ে। লেখিকা যেন সে কথাই বলেছেন শুধু মাত্র দুটি লাইনের মধ্যদিয়ে,-

> "গৌরবী আর হারা অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। শহরে গৌরবী আর হারার সমাজ অনেক বড়। সমুদ্রের মতো। সেখানে একবার মিশে যেতে পারলে আর কোন ভয় থাকে না।"[৪৮]

বস্তুত মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পের মধ্যদিয়ে সমাজেরনিম্নস্তরে বসবাসকারীমানুষের সাম্প্রদায়িক বিভেদের কথা তুলে ধরলেও প্রকৃত পক্ষে এই গল্পের অন্তরালে যেন একজন করুনাময়ী মায়ের মাতৃত্বের, মায়া মমতা, মানবিকতা এবং বিবেক বোধেরই সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। পাশাপাশি এক অভাগিনী মায়ের বঞ্চনার দিক গুলিকেই নির্দেশ করেছেন।

একজন মা তার সমস্ত মায়ামমতা স্নেহ ভালোবাসা এবং সর্বোপরি নিজেকে শেষ করে দিয়ে হলেও সন্তানকে যেভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে মানুষ করে এবং সেই মা-ই নিজের সন্তানের দ্বারা বিতাড়িত হয়। তাই এই গল্পে একদিকে মাতৃত্বের বঞ্চনার কথা আবার অন্যদিকে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে মাতৃত্বের নতুন সংজ্ঞায়নের কথা উঠে এসেছে এই গল্পে।

‘নেশা’

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৮/১৯৭১ খ্রী. পত্রিকার নাম অজ্ঞাত

'নেশা' গল্পে মহাশ্বেতা আরো এক 'মা' চরিত্রকে তুলে ধরেন। এই গল্পের 'মা' চরিত্রটি হল গোপালী। সে মানুষের বাড়িতে কাজ করে। শহরে থাকে, যে পরিমান টাকা মাসিক উপার্জন হয় তার স্বামী উপিন্দ তার কাছ থেকে মাসের শেষে এসে নিয়ে যায়। তার স্বামী রান্না – বান্না করে সন্তান দের দেখা শুনা করে অর্থাৎ একজন নারীর যা করা উচিৎ এবং একজন পুরুষের যা কাজ করা উচিৎ তার ঠিক উল্টোরকম ভাবে চলে গোপালী আর উপিন্দর সংসার। গোপালী ভাবে যে সে কাজ করতে বাধ্য কেননা সে উপিন্দকে বিয়ে করার সময়,

> "এক খানা কাগজে টিপ ছাপ দিয়ে কবুল করেছিল সারাজীবন উপিন্দকে পুষবে। ছেলে মেয়ে হলে তাদের পুষবে যতদিন বাঁচবে ততদিন। সেই কাগজ খানাকে গোপালী এখন ভিষণ ভয় পায়। উপিন্দ তাকে আজ বারো বছর ধরে ভয় দেখাচ্ছে সেই কাগজ খানার জোরে সে গোপালীকে জেল খাটাতে পারে।..... বারো বছরে তিনটে মরা আর ছটা জ্যান্ত সর্বোমোট নয়টা ছেলে মেয়েকে সংসারে আনবার পরিশ্রমে গোপালীর বুক ধরফর করে, মাথা কেবলই ঘুরে। শরীর ভাঙছে বলেই হয়তো উপিন্দের ভয় ধরানো কথাগুলোকেও আরও বেশি বিশ্বাস করে।"[৪৯]

পিতৃতন্ত্র নারীকে শোষণ করার কত যে কৌশল নির্ধারণ করে তার একটা দৃষ্টান্ত এই গল্পটি। বেকার থেকেওপ পুরুষ কীভাবে নারীকে ঘরে বাইরের শ্রমে শোষণ করে চলে, গোপালী তার নিদর্শন। পুরুষতন্ত্র চিরকালই নারীকে ভীতি প্রদর্শনে জব্দ করেছে, এখানে গোপালীর কাছেও টিপসই দেওয়া একখানি কাগজই ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। তাইতো উপিন্দর দেখানো ভয়েই তাকে একদিকে গাধার মতো পরিশ্রম করায় অন্যদিকে তার উপার্জনের সমস্ত টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়। উপিন্দর মতো আজও বহু মানুষ রয়েছে যারা শুধুমাত্র বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিজে আরাম দায়ক নিষ্কর্ম জীবন যাপন করে। কেননা এরা কাজকে ভয় পায়, পরিশ্রমকে ভয় পায়। তাইতো পরিশ্রমের বিনিময়ে যে কোন কাজ

করতে রাজি থাকে। তাই নিজের স্ত্রী পুত্রকেও নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে অন্যের হাতে তুলে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অথচ স্বামীর প্রতি সন্তানের প্রতি গোপালীর স্নেহ ভালোবাসা, করুনা, মায়ামমতার বিন্দু মাত্র ত্রুটি নেই তাইতো স্বামী আর সন্তানের প্রতি তার মমতাময়ী প্রলাপ,

> "না গো মা, আন্না করে, ছেলে মেয়ে খাওয়ায়। নাওয়ায় চুল ছেনে (আছরে) দেয়। আমি যেমন মাছের মা ছেলে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। উনি সে অকম লয় গো মা। মায়া মমতাও বেস্তর।"[৫০]

নিজের বুভুক্ষু হৃদয় সম্পর্কে তার মনোভাব হল,

> "আর মা! রক্ত দিয়ে গড়া সন্তানগুলোকে কাছে পাই না মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা যেন শেয়াল আঁচড়ে মরে গো মা! আমি এক মহা পাপি গো মা।"[৫১]

উঁচু জাতের উপিন্দকে বিয়ে করার পরিনাম যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা গোপালী হারে হারে বুঝতে পেরেছে। চড়ক মেলায় গোপালীর বড় মেয়ে হারিয়ে যায়, রথের মেলায় খোড়া ছেলেটা হারায়। বাতাসীকে চড়ক মেলায় যাওয়ার কথা বলে নিয়ে গিয়ে উপিন্দ বাতাসীকে বিক্রি করে দেয়। আর খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে যাওয়ার ভান করে গোপালীকে খবর দেয়,

> "ও বউ আমি মাতা ঘুরে মরব! ও বউ যতক্ষণ বাতাসীকে চেইছিলি কেন বা আমি দেইনি গো! তাহলে তো সে ঘরে আইতো গো! এ আমি কী করে এলাম বল গো! অনুতাপে অনুশোচনায় এতই কাঁদল উপিন্দ। এত বার দড়ি কলসী,

> কেরসিন দেশলাই, সেঁকোবিষ কড়িফল, বাসের চাকা ট্রেনের চাকার খোঁজ করল যে, গোপালী তো আর ভয়ে বাঁচে না।”[৫২]

গোপালী বুজতেও পারেনি তার স্বামীর এই আচরণ শুধুমাত্র অভিনয় ছাড়া আর কিছুই না। কেননা স্বামীর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের জোড়েই গোপালী তার সন্তানদের তাদের পিতার নিকট রেখেছে নিশ্চিন্তে নিজের করার জন্য। তাইতো তার সন্তানরা তাকে চেনে না। এই বিশ্বাসই নারী করে এসেছে চিরকাল পুরুষের উপর।

> “ওরাতো মাকে চেনে না, বাপকে চেনে। গোপালী তো মাছের মা। মাছের মা ডুব জলে ডিম ফোটায় ফুট জলে ছানাদের ছেড়ে দেয় বাপের জিম্মায়। দিয়ে শ্যাওলায় ডুব মারে।”[৫৩]

গোপালীর অবস্থাও এখানে সেই মাছের মতো। কিন্তু দু:খে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার কষ্ট কিসে। তাই দু:খ ভুলতে নিজের কাজের পরিমানটাই বাড়িয়ে দেয় আরও কুড়ি টাকা বেশি উপার্জনের জন্য। কিন্তু এই উপিন্দ যে গোপালীর জীবনে কাল সাপ হয়ে এসেছে সেটা গোপালী বুঝতে পারে না। সে দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষে রাখছে। কেননা তার স্বামী খোঁড়া ছেলেটাকেও রথের মেলায় গিয়ে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু সেবারে সে ধরা পরে যায়,

> “খোঁড়া ফিরে এসেছে গৌরবীর কোলে চরে। উপিন্দর ছেলে মেয়েগুলো এসেছে। উপিন্দকেও ওরা টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। গামছা জোড়া করে উপিন্দর হাত দুখানা বেঁধে ওরা গোপালীর পায়ের কাছে উপিন্দকে বসিয়ে দিল।.....তোমার বর বাতাসীকে পশ্চিমাদের কাছে বিচে দিয়েছিল। খোঁড়াটাকে নিয়ে যেয়েছিল, বিচে দিয়েছিল কাদের কাছে জান?

> ভিক্ষমাঙাদের কাছে। ওরা খোঁড়াকে দিয়ে ভিক্ষে করাত, দূর দেশে নিয়ে যেত।.....গোপালী উপিন্দকে মারতে আরম্ভ করল। মারতে মারতে গাল দিতে দিতে যতক্ষণ না গোপালীও অজ্ঞান হয়ে গেল ততক্ষণ ওকে কেউ সড়াতে পারলো না।....”[৫৪]

সন্তান হারানোর বিরহ বেদনায় ক্ষত বিক্ষত গোপালীর এই আচরণ অতি প্রাসঙ্গিক কিন্তু তার মাতৃহৃদয়ে সন্তানের জন্য যতখানি স্নেহ রয়েছে তার স্বামীর প্রতিও রয়েছে ঠিক ততখানি কোমল ভাব। তাইতো গ্রামের সবাই ভেবে নেয় যে গোপালী আর কখনো উপিন্দকে মাপ করবে না। তাকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে না। কিন্তু গোপালী তার ঠিক বিপরীত ধর্মী ভাবনার মানুষ। তাই সাধারণ মানুষের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন গোপালী। তাইতো সবাই তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাস করলে গোপালী আত্ম যন্ত্রনায় দগ্ধ হয়ে বলেছে,

> “মুখ কি আর দেখতে ইচ্ছে যায়? উ ভাত আধে আমি দুটো খাই। উ একদিকে মুখ ঘুইরে ঘুমায় আমি উল্টোবাগে মুখ ঘুইরে থাকি। কি যে বলো মা! উ মুখ আরো দেখতে সাধ যায়?”[৫৫]

উপিন্দকে ঘরে তোলার কারন জিজ্ঞাস করলে পরে গোপালী বলে, -

> “উ কে যখন বললাম এমন নিরশংস কাজ কেন করছিলে? উ কি বললে যান? কেঁদে বলল বউ ভাতের লেশা, দুজ্জয় লেশা! চার টাকা পালি চাল, পাঁচ টাকা পালি চাল ওরা খায় না আমি খাই বল? ই কথা বলল যখন, আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।”[৫৬]

মহাশ্বেতার প্রতিটি গল্পে বেঁচে থাকার উপকরণ গুলি এক একটি করে চরিত্র হিসেবে উঠে আসে। কোথাও জল, কোথাও নুন, কোথাও চাল অথবা মানুষের বেঁচে থাকার নিত্য নৈমিত্তিক চাহিদা গুলো মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। 'নেশা' গল্পেও ভাতের নেশাই মুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গল্প পাঠকেরা একটু গভীরভাবে ভাবলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এই উপিন্দ নামের লোকটি যে তার নিজের সন্তান কে বিক্রি করে দিয়ে পেটের চাল সংগ্রহ করেছে। এই বিষয়টিকে অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও আমাদের তাকে দোষী বলতে একটু যেন ভাবতে হয়! কেননা সেতো অভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। পরিচালিত হয়েছে নেশার দ্বারা যে নেশার নাম ভাতের নেশা। এই নেশার জন্যই গোপালী এবং তার মতো হাজার হাজার গোপালী ঐ ভাবেই মানুষের বাড়িতে বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে বেড়ায়, সম্ভ্রম খুইয়ে পেটের নেশা মেটায়। পশুর মতো পরিশ্রম করে। মানুষ আর পশুর মধ্যে যে বিভেদ আছে সে বোধকে ভুলে গিয়ে মানুষের মুখোস ধারী পশুরা তাদের ভোগের সামগ্রী করে। তাইতো ক্ষুধার জ্বালা সন্তানের মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসাকেও পেরিয়ে যায়। আর সে কারনে বোধহয় গোপালীও তাকে দোষী বলে মনে করতে পারেনি। এবং এই অসহায় নৃশংস কাজের মূল কারনকে অনুসন্ধান করে বলতে পেরেছে,

> "ভাতের নেশা বড় খারাপ নেশা মানুষকে অমানুষ করে দেয়। উ-র কুন দোষ নি গো। পেটের দোষ আর আমার কপালের দোষ।..."[৫৭]

গোপালী বুঝতে পারে পেটের জ্বালা কত বড় জ্বালা। এই পেটের চেয়ে বড় ভগবান নেই। এই পেটের ভাতের নেশার চেয়ে বড় নেশা আর এই পৃথিবীতে নেই। তাইতো সেই নেশায় মত্ত হয়েই উপিন্দ ছেলে মেয়েদের বিক্রি করে দেয়। আর সে কারনেই গোপালী উপিন্দর প্রতি কোন রাগকে পুষে রাখতে পারে না। তাকে মাপ করে দেয় এবং পুনরায় গোপালী পূর্বের মতো কাজে যোগদেয়। আসলে মহাশ্বেতা গোপালী – উপিন্দর জীবনে ঘটে যাওয়া তিক্ততার মধ্যদিয়ে কতকগুলো মৌলপ্রশ্নের সম্মুখিন করে আমাদের। মায়ের সঙ্গে

সন্তানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সত্ত্বেও কখন মা সন্তানকে বেঁচে দেয়! যদিও এ গল্পে ঘটনাটি ঘটেছে বাবার ক্ষেত্রে। তাহলেও মায়ের ক্ষেত্রে এমন ঘটনার নজীর সংবাদ পত্রে আজও মেলে। এক্ষেত্রে উপিন্দের সন্তান বিক্রির ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে কিন্তু তা যদি গোপালীর ক্ষেত্রে ঘটতো সে ক্ষেত্রে কি একই ব্যাখ্যা কাজ করে। তবুও মনে হয় তলিয়ে ভাবার বিষয় এটা যে একজন মা তার নারী ছেঁড়া ধনকে কীভাবে বিচ্যুত করতে পারে নিজে থেকে সেখানেও কি তাকে প্রভাবিত করে পিতৃ তন্ত্রের প্রলোভনের আশ্বাস। আর তা যদি না হয় তবে এ প্রশ্ন আমাদের আজও তাড়িত করে যে মাতৃত্বে অচ্ছেদ্য বন্ধন না জীবনের দুর্জয় আকাঙ্খা – কোনটা নারীর কাছে প্রাধান্য পাবে। গোপালী উপিন্দকে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতার ঈঙ্গিত কি আমাদের সেই প্রশ্নের দিকেই ধাবিত করে না!

প্রথম প্রকাশের স্থানকাল অজ্ঞাত, পুনর্মুদ্রন : মহাশ্বেতার পঞ্চাশটি গল্প/প্রতিক্ষণ ১৯৯৬ খ্রি:,

এই গল্পে শনিচরী নামের এক 'মা' চরিত্রের নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস প্রিয় রহস্যময় জীবন যাপন পদ্ধতিকে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা। টাহার গ্রামের সংখ্যাগুরু গঞ্জু ও দুসাদরা অসুমার দারিদ্রতার মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। জাতে গঞ্জু শনিচরী তার শাশুড়ির মৃত্যুতে একফোঁটাও চোখের জল ফেলেনি। শাশুড়ি বলেছিল শনিবারে জন্মালে নাম শনিচরী হয়, বউ অপয়া হয়। শাশুড়ি বেঁচে থাকায় যথাযথ উত্তর দিতে পারেনি বলে একা একা শুধু মনে মনে ভাবে,- 'তুমি তো সোমরি ছিলে কোন সুখে জীবনটা কাটলে ? সোমরি, বুধুয়া, মুংরি, বিসরি, কার জীবনটা সুখে কাটে?'[৫৭] এখানে মহাশ্বেতা শনিচরীর মধ্যদিয়ে সমাজের সেই রিক্ত নি:স্বজনদের অভাব বোধটাকেই তুলে ধরেছেন। কেননা শনি, রবি, সোমবার প্রভৃতির কোন বিষয় নয়। সমাজে যখন অভাব হয়ে ওঠে জন্মগত অধিকার তখন আর দিন, তারিখ, বারের কোন মূল্য থাকে না। এখানকার দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা জোতদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং একই সঙ্গে শোষিতও। তাইতো এদের এই করুন পরিনতি। কেননা সমাজের সব চেয়ে নিম্নতম মজুরিতে কাজ করে আবার জমিদার জোতদারের ঋণ শোধ করার তাগিদও সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। আবার উচ্চশ্রেণির কোন কিছু হারিয়ে গেলে বা চুরি গেলে দোষ গিয়ে পরে সেই খেটে খাওয়া মেহনতি করা সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষ গুলোর উপর। আর এ কারনেই শনিচরী তার শাশুড়ির মৃত্যুতে কাঁদতে পারেনি। মালিক মহাজন রামাবতার সিং তার একটাল গম চুরি যাওয়ার অপরাধে সমস্ত দুসাদ ও গঞ্জুদের জেলে পুরে দেয়। এমন সময় তার শাশুড়ির মৃত্যু হয় তাইতো শাশুড়ির সৎকারের সমস্ত দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে শনিচীর উপর। আর এই দায়িত্ব পালন করতে ব্যস্ত থাকাটাই কাঁদার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়।

শনিচরীর স্বামী মারা যায় তবুও সে কাদেনি। শনিচরীর স্বামীর মৃত্যুর কারনও ভীষণ মর্মান্তিক। শুধু শনিচরীর স্বামী নয় তাদের মতো অন্নহীন নিরন্ন আরও অনেকেই এই মর্মান্তিক মৃত্যুর সঙ্গী হয়েছিল। শিব পূজারদিন,-

> "মেলা খুব জমেছিল। বড় বড় রহীস লোকরা শিবের মাথায় ঢালছিল ঘড়া ঘড়া দুধ। সেই দুধ কয়েকদিন ধরে মাটিকাটা চৌবাচ্চায় জমেছিল। টক দুর্গন্ধ উঠেছিল দূর থেকে, মাছি ভন ভন করছিল। পান্ডাকে টাকাদিয়ে সেই দুধ গেলাস গেলাস খেয়ে অনেকের হায়জা হয়, অনেকে মরে বুধুয়ার বাপও মরেছিল হায়জায়।"[৫৮]

সে সময় সমস্ত মরা রুগিকে সরকারী লোকেরাই এক সঙ্গে জ্বালিয়ে দেয়। জন্ম এবং মৃত্যু দুটই এদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অভ্যাসের প্রক্রিয়া মাত্র। তাই কান্না – হাসির মতো এদের মানবিক বোধগুলো অভাবের নিষ্ঠুরতার বাস্তবতার কাছে হারিয়ে যায়। আর বুধুয়াকে মানুষ করার চিন্তা তার কাছে অনেক বড় হয়ে ওঠে স্বামীর মৃত্যুর চেয়ে। তাই তো স্বামীর মৃত্যুতেও সে কাঁদতে পারে না। এই গল্প উচু তলার সংস্কারাচ্ছন্ন পাথরে দুধ ঢালা উচ্চ শ্রেণির মানুষ গুলোর অসার অনড় মানসিক অবস্থান এবং নিচু তলার লোকের অসহায় দূর্বলতার বৈষম্যের ছাপই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শনিচরীর ছেলে বুধুয়া বড় হয় এবং বিয়ে করে। কিন্তু এই বেঁচে থাকার উপকরণ হীন পরিবেশে বুধুয়া সুস্ত থাকতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই হাড় ভাঙা পরিশ্রম করছে বুধুয়া। বুধুয়ার শরীর শীর্ণ। সে বিয়ে করেছে তার বউ অন্ত:সত্তা। গর্ভে সন্তান আর সে কারনে তার খিদে অনেক বেশি। তার প্রয়োজনীয় খাবারের তুলনায় অনেক কম খাবার পায় বুধুয়ার বাড়িতে। বুধুয়ার বউ সন্তান প্রসব করে ছেলে সন্তান। তারপর একদিন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় হাটের নাম করে। আর ফিরে আসে না। শনিচরী পুত্রবধু হারানোর বিরহ ব্যথা–বেদনায় কাঁদে না। অবশেষে একটা মাত্র ছেলে বুধুয়াও যক্ষ্মা রোগে মারা যায়।তথাপি শনিচরী কাঁদতে পারে না। একের পর এক বোঝা চাপে শনিচরীর জীবনে। কেননা বউকে খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে,

> "ঘরে ফিরে শনিচরী বুধুয়াকে জীবিত দেখেনি, বউকে ঘরে দেখেনি। বাচ্চাটা তার ঘরে কাঁদছিল। বউ আর ফেরেনি। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বুধুয়ার দাহের ব্যবস্থা করা, বউ পালাবার কেচ্চা চাপাদিতে ছুটোছুটি করা, এই সব করতে গিয়ে বুধুয়ার জন্যও কাঁদা হল না। কাঁদতে পারত না শনিচরী। কেমন যেন ধন্ধ ধরে বসে থাকতো। তারপর চোখ বুজে শুয়ে থাকতো।"[৫৯]

বুধুয়ার মৃত্যুর চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় শনিচরীর কাছে তার নাতি অর্থাৎ বুধুয়ার ছেলে হরোয়াকে মানুষ করা। তাইতো শনিচরী হরোয়াকে নিয়েই চিন্তা করে। তাকে বড় করার, ভালোভাবে মানুষ করার, অসৎ পথে না যাওয়ার। এই ভাবতে ভাবতে বুধুয়ার বউয়ের কথা মনে পরে যায় এবং বলে,

> "গেল যখন ওইভাবে হারিয়ে গেছে। সেই ভালো নইলে মালিকের ঘরে সে থাকতো রানি হয়ে। শনিচরী আর হরোয়া বাইরে গোলাম খাটত, সে ভাড়ি অপমানের কথা হত। তাছাড়া শনিচরী আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে জানে।"[৬০]

এতেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শনিচরী দের মতো ব্রাত্য মানুষেরা অভাব বোধের মধ্যদিয়ে জীবন যাপন করলেও আত্ম সম্মান বোধটাকে কখনো বিসর্জন দেয় না। এবং অপরদিকে জমিদার, মহাজন এবং মালিকদের মতো মানুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বলে কিছু থাকে না। তারা যুবতি মেয়ে বা বউ দেখলেই নিজের বাড়ির সজ্জা সঙ্গিনী 'রেন্ডি' করে রাখে। এদের না কোন বিচার হয়। আর নাতো কেউ বিচার করতে পারে। কেননা এরা যা বলবে, যা করবে সেটাই নিয়ম, সেটাই বিধি। এই বিধি লঙ্ঘন করার ক্ষমতা খুব কম সংখ্যক মানুষের মধ্যে থাকে। এদের ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে দুলন বলে,

> "ভৈরবের বাপ রামাবতার, এরা যে রান্ডিদের রাখত তাদের দেখ ভাল করত। সেই মমতায় রান্ডিরা এসে কেঁদে গিয়েছিল ওরা মরলে। ভৈরব, দৈতারি, মখখন, লছমন এদেরও রান্ডি আছে। কিন্তু ক্ষেত মুজুর ঔর রান্ডি, সকলকে এরা পায়ের নিচে রাঁখে। তাতেই রুদালী জোটে না। খতরনাক খচরাই সব। সব সে হারামী যো গম্ভীর সিং। রান্ডি রাখলো সে ঘরে মেয়ে এলো। রান্ডি থাকতে মেয়েকে দুধে ঘিয়ে রাখতো। রান্ডি মরতে মেয়েকে বলল তোকে পুসবো না আর। রান্ডির মেয়ে রান্ডি, কাজ করে খা গিয়ে।"[৬১]

এই মহাজন শ্রেণির মানুষেরা এতটাই ভয়ঙ্কর যে নিজের স্বার্থে আঘাত বা ব্যঘাত ঘটলে নিজের রক্তকেও অস্বীকার করে এরা যতদিন মানুষের প্রয়োজন এবং নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা চলে ততদিন ব্যবহার করে যখন স্বার্থ শেষ হয়ে যায় অথবা প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তখন লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তাই তো গম্ভীর সিংহের মতো জমিদারেরা রেন্ডি রাখে, নিজের জৈবিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে। কেননা এদের উপর কথা বলার মতো ক্ষমতা কারো নেই। শুধুমাত্র সমালোচনা করা ছাড়া। এই সমালোচনা করতে গিয়েই দুলন শনিচরীকে বলে,

> "রাধা রান্ডী মোতিয়া। তাকে বউয়ের সন্মানে রেখেছিল মোতিয়ার মেয়ে গুলবোদন্তি রূপার মল পরিয়ে কোলে নাচাত। মোতিয়া মরে যেতে গুলবোদনকে সাদী দিবে বলেছিল। আজ দেখি সেই গুলবোদন তোহরি যাচ্ছে। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। বলল, জনম দিতে জানে, পাল পোশ করতে শেখেনি বেড় করেদিল আমাকে। ....বুড়ার ভাতিজা খুব নাকড়া জুড়েছে কতদিন। বলতে গেলাম, তা আখ মোটা করে বলল, মা মরে গেছে তিন মাহিনা তুই কেন ঘর জুরে

> বসে আছিস? ভাতিজা কি বলে শুনতে হলে শোন নয়তো চলে যা। রান্ডির মেয়ে তোর ভাতের অভাব কি?”[৬২]

বস্তুত মহাশ্বেতা নারীর উপর একই সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্যের চাপ এবং ঔপনিবেশিক চাপ যে কীভাবে বর্তায় সে কথাই এই কাহিনির অন্তরালে বলার চেষ্টা করেছেন। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী আদিবাসী অন্তে:বাসী যে কোন নারীরই দৈহিক শোষণ ও নির্যাতন স্বাভাবিক এবং সাধারণ ব্যাপার হয়ে দেখা দিয়েছে। সম্পর্কের সূত্রে গুলবদন গম্ভীর সিংহেরই কন্যা, কিন্তু তার অপরাধ সে রান্ডির গর্ভে জন্ম গ্রহন করেছে। তাই তো এই ক্ষেত্রে সে গম্ভীরের সন্তান নয় শুধু মাত্র রাধা রানীর সন্তান। তাইতো তাকে গম্ভীর সিং নিজের ভাতিজার কাছে রাত কাটাতে যেতে বলতে কুন্ঠিত বোধ করেনা। নোংরামি যেন ঐ শ্রেণির পুরুষ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। আবার ক্ষমতা বা প্রতাপের দ্বারা সমস্ত কিছুকে নিজের আয়ত্বে করে নিয়েছে। তাই তো এরা সমস্ত কিছু নিজের ইচ্ছানুযায়ী করতে পারে। এভাবেই গোমস্থা শনিচরীকে বলে,

> “মালিক মহাজন যা বলে তাই। পাপ এবং পূন্য হল দেখার ভুল। দুষ্ট লোক বলবে যে মালিক-পরোয়ার, বাপ বেঁচে থাকতে ডাকাতি করেছে আংরেজ আমলে, স্বাধীন ভারতে একাধিক লাশ স্বহস্তে ফেলেছে, লছমনের বাপের ঘোড়া চুড়ি করেছে দুসাদ টোলি স্বহস্তে জ্বালিয়েছে, মেয়ে ছেলেদের বহুজনকে নষ্ট করেছে, সে মহাপাপি। মালিক নিজে তা মনে করে না। তাইকি পাপের জন্য মহাব্যাধি হল, তা জানার জন্যে বাড়িতে জ্যোতিষী গনকের মেলা বসেছে।”[৬৩]

কিন্তু মানুষ পাপ করলে তার প্রায়শ্চিত্য ভোগ করাটা একটা স্বাভবিক ব্যপার, তাইতো গম্ভীর সিংয়ের কঠিন ব্যাধিতে মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেয় শনিচরী,

> "গম্ভীর সিং মরছে অন্য রোগে। অসুমার নারি সঙ্গ করার ফলে দেহে ঘৃণ্য রোগ শরীর গলে পচে যাচ্ছে। সেই জন্যেই এত যাগ-যজ্ঞের ঘটাপটা। রোগের জ্বালাতেই ওষুদ-বিষুধ না খেয়ে গম্ভীর সিং মরনকে কাছে ডাকছে।"[৬৪]

গোটা সমাজ যখন গম্ভীর সিংকে তার অপকর্মের শাস্তি দিতে অপারগ তখন এই ক্ষমতার অপব্যবহারই তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন শাস্তিটি দিয়ে দেয় যার নাম মৃত্যু। শরীর গলে পচে দুর্গন্ধে ভরে ওঠে। এই মৃত্যু সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যেও সচরাচর ঘটে না। কঠিন ব্যামোর মধ্যদিয়েই তার অপকর্মের শাস্তি সে গ্রহন করে।

অপর দিকে শনিচরীর সর্বশেষ প্রত্যাশাও হারিয়ে গেছে, তার সেই একমাত্র শেষ সম্বল বুধুয়ার ছেলে হরোয়াও চলে যায় ম্যাজিক ওয়ালাদের পিছনে। শনিচরী নাতি হারিয়ে যাওয়াতেও কাঁদেনি। অবশেষে দেখা হয় ছোটবেলার বান্ধবী বিখনীর সঙ্গে। অবস্থানগত দিক থেকে দিক থেকে এই শনিচরী এবং বিখনীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শনিচরীর সবাই ছিল চলে যেতে যেতে এখন একাকিত্ব রয়েছে শুধু আর বিখনীর সবাই আছে অথচ তার সবাই থেকেও আজ কেউ নেই। সমপর্যায়ের দুই নারীর মিলনে দুজনে দুজনের সমস্ত দু:খ কষ্টগুলিকে বিনিময় করার সুযোগ পেল। তার দুজনেই শনিচরীর বাড়িতে আশ্রয় নেয় বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনে। এদের কেউ নেই যে খেতে দেবে, একটু পরিচর্চা করবে। তাইতো বেঁচে থাকার জন্য শুরু করল এক নিত্য নতুন জীবিকার কাজ। আর তা হল অন্যের শোকে কান্না বিক্রি। জমিদার,মহাজন, জোতদার প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণির পয়সা ওয়ালা লোকের বাড়িতে যদি কেউ মারা যায় তা হলে সে মরা লাশের উপর পরে চার দিকে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদতে থাকাটাই তাদের জীবিকা! শনিচরীর চোখে জল আসে না সে সংশয়ে থাকে তখন দুলন বলে,

> "বুধুয়াকে মা! যে কান্না তুই বুধুয়ার জন্যে কাঁদিস নি তা কাঁদতে বলছি না তোকে। এ হল রুজির কান্না দেখবি যেমন

> করে গম কাটিস, মাটি বয়ে নিস, তেমনি করে কাঁদতেও পারছিস।”[৬৫]

শনিচরী ও বিখনী এই দুই কর্মেই নিযুক্ত হয় চির দিনের জন্য। এরা খবর নেয় এলাকায় কোথায় কে মারা যাবে। মানুষের মৃত্যুই কামনা করে। কেননা একটি মানুষ মরে গেলে এরা দুদিন পেটভরে খেতে পারে আবার কিছু অতিরিক্ত পয়সাও পাবে যা দিয়ে কয়েকদিন নিজেকে চালাতে পারবে। তাইতো এরা মানুষের মৃত্যু কামনা করে। অভাব যখন চরমে ওঠে তখন জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে বোধয় সব সীমানা লুপ্ত হয়ে যায়। তখন এদেরও মৃত্যু কামনাকে খুব একটা অপ্রসঙ্গিক বলে মনে হয় না। এরা নিজেরা নিজেদের কান্নার দামও ঠিক করে ফেলে,

> “শুধু কাঁদলে এক রকম রেট। কেঁদে লুটলে পাঁচ টাকা এক সিকি। কেঁদে লুটিয়ে মাথা ঠুকলে পাঁচ টাকা দু সিকি। কেঁদে বুক চাপরে শ্মশানে গিয়ে শ্মশানে লুটোপুটি খেলে ছয় টাকা দিতে হবে। ক্রিয়াতে কাপড় চাই। সে কাপড় কাল থান হলেই ভালো।”[৬৬]

অভাব অবহেলা এভাবেই মানুষকে যন্ত্রমানবে পরিনত করে। এই নিম্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষদের কাছে মানবিকতা বোধের কোন মূল্য নেই, নাকি বলা ভাল সমাজ এদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার বোধ টুকুও কেড়ে নিয়েছে। জমিদার, জোতদার ও মহাজনের যৌন সঙ্গী হওয়া ছাড়া কোন স্বাভাবিক গৃহস্থ জীবন যাপন করতে পারে না তারা। এই মালিক মহাজনরাই রাখনি তৈরি করে। ‘মালিক মহাজন যত মেয়েকে নষ্ট করে তারা রান্ডি হয়।’ আর এই রান্ডীর জীবন যাপন প্রনালী একবার যদি শুরু হয় তাহলে তা বংশ পরম্পরা অনুযায়ী চলতে থাকে আজীবন কাল। এদের এই পরিনতির জন্য দায়ি করা যায় এই জমিদার, জোতদার, মহাজন শ্রেণিকে সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এদের একচেটিয়া মানুষ মারার খেলার ইতি বর্ণনা করেছেন দুলন এভাবে,

> "রাজপুতরা এই আদিবাসী ও অন্ত্যজ অধ্যুষিত অঞ্চলে ঢুকে পরে জমিদার থেকে শুরু করে জোতদার-মহাজন মালিক পরোয়ার হয়ে বসে, তা বোঝার পক্ষে খুবই সহায়ক। এই রাজপুত্ররা ছিল ছোটনাগ পুরের রাজার সরিকের সেনা বাহিনীর লোক। শ'দুয়েক বছর আগে এদের নানা বিধ অত্যাচারে অতিষ্ট কোলরা বিদ্রোহ করে।কোল বিদ্রোহ দেখাদিতে না দিতেই রাজা দেন এদের লেলিয়ে। কোল বিদ্রোহ দমন করার পরেও ওদের সামরিক জোস কমে না। এরা মেরেই চলে নিরিহ কোলদের জ্বালিয়ে চলে শান্ত গ্রাম গুলি। হরদা এবং ডোনকা মুন্ডা তখন আবার কাঁড়ে সান দিতে থাকে। আবার কোল বিদ্রোহ ঘটার উপক্রম ঘটে। তখন রাজা এই রাজপুতদের নামিয়ে দেন বসতিবিরল টাহার অঞ্চলে। বলেছেন, মাথার উপর তরোয়াল ঘুড়িয়ে ছোঁড়। যতদুর গিয়ে তরোয়াল পড়ল, ততদূর পর্যন্ত জমির দখল নাও। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অব্দি তরোয়াল ছুঁড়ে চলে। তোমরা সাত সর্দ্দার, এই ভাবে যত জমি পেলে, ততজমি নিজে চাষবাস করো।..... এখন এরা জোতজমা বাড়ায় তবে তরোয়াল ছুঁড়ে নয়, বন্দুকের গুলি মানুষের গাঁয়ে ছুঁড়ে এবং জ্বলন্ত মশাল মানুষের বসতিতে ছুঁড়ে দিয়ে।"[৬৭]

সমাজ সংস্কৃতিতে সম্পত্তি দখলের রাজনীতি সেই যে আদিযুগ থেকেই শুরু হয়েছে তা আজও অব্যাহত রয়েছে। উচ্চ আভিজাত্য শ্রেণির সেই শোষণ পদ্ধতি রয়েগেছে শুধুমাত্র তার ধারপথ বদল হয়েছে। শাসন ব্যবস্থা অতীতে যা ছিল আজও তাই রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত যে সমস্ত ধারা পদ্ধতি নির্মিত হয় সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির উদ্দেশ্যে তা আদৌ কত যে কার্যকরী হয়েছে সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। সংবিধানের নিয়মে সংরক্ষিত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ক্ষয়িষ্ণু জীবনী এদের আসল পরিচয়। দেশের

সর্বেসর্বা জোতদাররা প্রতিনিয়ত আরও উন্নত হয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে হয় বলিষ্ঠ। এছাড়াও তাদের অর্থ সম্পত্তি প্রতি নিয়ত বার বারন্ত; অপরদিকে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা প্রতি নিয়ত সংকট থেকে আরও সংকটময় অবস্থায় ফিরে যায়। এদের না আছে ভূত, না আছে ভবিষ্যত। চিরকাল গৃহহীন, খাদ্যহীন, অন্ন বস্ত্রহীন, কর্মহীনতায় দিন যাপন করছে অসুমার দু:খ দরিদ্রতার মধ্যদিয়ে। অথচ প্রতিনিয়ত কায়িক পরিশ্রম করে যাচ্ছে শুধুমাত্র দুবেলা দুমুঠো খাবার জন্য। এতটা পরিশ্রমের পরেও আহার্য সামগ্রীর যথাযথ উপার্জন করতে পারছে না। এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে পরে যায় শনিচরী, বিখনী, দুলন, হরোয়া প্রভৃতি গঞ্জু ও দুসাদরা। তাদের প্রতিনিয়ত শোষন করছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অথচ এরা বুঝে না জোতদাররা জমিদারের রাজনীতির শোষনের মাত্রা, আবার অধিকাংশ সময়ে সব জেনে বুঝেও চুপ করে থাকা ছাড়া এদের কিছু করার উপায় থাকে না। তাইতো নিম্নশ্রেণির মানুষেরা জমিদারের বন্দুকের গুলির সামনে দাঁড়াতে পারে না। পারে না সৎসাহস করে এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। পারে না নিজের মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করতে। তাইতো এক শ্রেণির মানুষ হয় ক্রীতদাস, নরকের দ্বার আবার আর এক শ্রেণির মানুষ হয় প্রভু বা দেবতা। এদের কথাই বলেছে দুলন,

> "জীর্ণ খাপরার চাল – শোভিত মলিন মেটা বাড়ির টলিতে অন্ত্যজদের বাস। আদিবাসীদের বসতি ও গরীব চেহারার। এর মাঝে মাঝে মালিকদের বিশাল মাকান। মালিকদের মধ্যে মামলা ও রেষারেষি থাকতে পারে কিন্তু মালিক শ্রেণি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এক। লবন, কেরসিন, পোস্টকার্ড ছাড়া এদের প্রায় কিছুই কিনতে হয় না। হাতি, ঘোড়া, মইষ বাথান, উপ-পত্নী, জারজ সন্তান, উপদংশ বা অন্য যৌনব্যাধি 'বন্দুক যার জমি তার' বিশ্বাস সকলেরই অল্প বিস্তর আছে। গৃহ বিগ্রহ আছে অগন্তি। দেবতারা এদের সমর্থক।"[৬৮]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নারী কিন্তু শুধুমাত্র বর্গগত দিক থেকে নয় লিঙ্গগত পরিচয়েও তাকে শোষনের সামগ্রী করে। আর সে কারনেই নিম্নশ্রেণির সুন্দরী রূপবতী নারীদের হাতি

ঘোড়া, মহিষের বাথানের মতো উপ পত্নীর বাথান।এই উপপত্নী গ্রহন যেন জমিদারের একটা সামাজিক মান্য অবস্থানের দিক। আর সে কারনে নারীরা হয়ে ওঠে শোষনের যন্ত্র মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এদের স্থান গৃহপালিত পশুর মতোই। যখন খুশি গ্রহন করে এবং আবার ইচ্ছা হলে ছেড়েও দেয়। আর এই গ্রহন ও বর্জনের খেলায় বিনষ্ট হয় নারীর জীবন।

শনিচরী জমিদারের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়নি বটে কিন্তু জমিদারী শোষনের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। শনিচরী একদিকে বিধাতার সঙ্গে নিজের অজান্তেই পরাক্রান্ত লড়াই করে গেছে। অপরদিকে সমাজের অতিবাস্তবিক রূপ অভাব, পেটের ক্ষুধার জন্য করেছে বিদ্রোহ। এই লড়াইএ কখনো থেমে থাকেনি আবার হারও শিকার করেনি। অবশেষে তার শেষ সঙ্গি বিখনীকেও হারিয়েছে চিরকালীন বাস্তবতার মধ্যে কিন্তু নিজের চোখের জল বের করে নি অথচ উপার্জনের জন্য শনিচরী কেঁদে লুটোপুটিখায়, মাথা কুটে, লাশের চার পাশে ঘুরে ঘুরে কাঁদে। শনিচরী নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সময়ের এই আশ্চর্য সমীকরণকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে কিন্তু হার শিকার করেনি অভাবের কাছে, বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসের কাছে। জীবনকেই প্রতিদ্বন্দ্বী করে শনিচরীদের এই সংগ্রাম চলতে থাকে। যতদিন সমাজ ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে ততদিন তাদের অবস্থারও কোন পরিবর্তন আসবে না।

‘বাঁয়েন’

প্রথম প্রকাশ : ‘অমৃত’ ১৩৮২/১৯৭৫ খ্রী.

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত এক ভয়াবহ কুসংস্কারের মূল স্বরূপ লক্ষ করা যায় ‘বাঁয়েন’ গল্পে। চন্ডী ভগিরথের মা এবং মলিন্দরের স্ত্রী। সে বংশ পরম্পরা অনুযায়ী চলে আসা কাজকে একনিষ্ঠভাবে করতে চায়। বংশগত কাজকে বজায় রাখার মতো মানুষ শুধুমাত্র চন্ডী ছাড়া আর কেউ নেই তাদের বংশে। তাই তো সে সমাজের সবচেয়ে সাহসের সেই মরা পুতে রাখার কাজটি করে। খন্তাদিয়ে মাটি খুঁড়ে পাঁচ বছরের ছোট শিশুরা মারা গেলে তাদের সে পুতে দেয় এবং কবরের উপরে কাটা, ঝোপ, ডাল পালা দিয়ে ঢেকে রাখে যাতে কোন শিয়াল কুকুর এই মরা লাশকে খেতে না পারে। গভীর রাতে হাতে হারিকেন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কবরের চার পাশে, কবর পাহারা দেয়। একদিন তার ননদের মেয়েকে কোলে নিলে, ‘কয়েকদিন পরে সেই শিশুটি .....মারা গেল। চন্ডীর বাড়িতে নয় অন্যত্র কিন্তু মেয়ের মা, বাবা, পিসি, কাকা সবাই বলতে লাগলো চন্ডীই ওকে নিয়েছে।’[৬৯] রাগে ক্রোধে ক্ষোভে চন্ডী সেই মরা পাহারার কাজ ছেড়ে দেয়। তারপর একদিন ঝড় জলের রাতে চন্ডী শেয়ালের ডাক শুনে এবং নিজেকে স্থির করতে না পেরে লাশ ঢাকার চেষ্টা করে এমন সময় স্বামী মলিন্দ ও গ্রামের লোকজন তাকে বাঁয়েন বলে। চন্ডী বাঁয়েন হয় এবং ফাকা মাঠে রেল লাইনের ধারে একাকিত্ব জীবন যাপন করে।

সাংস্কৃতিক রাজনীতির গ্যারাকলে মা ও সন্তানের মতো নিষ্পাপ নিরঙ্কুশ সম্পর্ককে ছিন্ন করতে বাধ্য হয় চন্ডী। তার এক মাত্র সন্তান ভগীরথ সে জানতো না বাঁয়েন কারো মা হয়। ‘মানুষ মা হয়, বাবা হয়, ছেলে হয়, মেয়ে হয়। বাঁয়েন কী মানুষ ? বাঁয়েন তো মাটি খুঁড়ে মরা ছেলে বের করে, আদর করে, দুধ খাওয়ায়, বাঁয়েনের দৃষ্টিতে একটা গোটা গাছ অব্দি চড়চড়িয়ে শুকিয়ে যেতে পারে। ভগিরথ তো একটা জলজীয়ন্ত ছেলে। ভগিরথ ভেবে

পায় নি।'[৭০] সমাজের চাপিয়ে দেওয়া এই বিশ্বাস ভগিরথ বুঝে না। সে বুঝতেও চায় না। কিন্তু তার শিশু সুলভ মন বাঁধা মানে না। মা এবং সন্তানের দৈবিক আত্মার টান এবং সম্পর্কের আকর্ষণই ভগিরথকে বাংবার মনে করিয়ে দেয় বাঁয়েনের কথা। তারও যেন শিশু হৃদয় মাতৃ স্নেহের জন্য পুলকিত হয়ে ওঠে। তাই সরাসরি মায়ের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবতে পারে না সামাজিক বিধি ভঙ্গ করে। কিন্তু তার মন সর্বদা সেই মায়ের দিকেই ধাবিত থাকত। ভগিরথ বিশ্বাস করেনি বাবার কাছে শোনা সামাজিক এই কুসংস্কারের নীতিকে। তাইতো,

> "শুধু ঐ দিকে মন চলে গিয়ে ছিল ওর। ধান ক্ষেতে থাক গরু নিয়ে থাক, কেবল মনে হত রেল লাইন ধরে ছুটে চলে যায় ওখানে। গিয়ে দেখে আসে একলা থেকে থেকে বাঁয়েন কি রকম ভয় পায়। দেখে আসে বাঁয়েন মাথায় তেল মেখে চুলের জল কেমন করে চৈতী বাতাসে শুকোয়।"[৭১]

এ যেন ভগিরথের এক বলা কথার মধ্যদিয়ে না বলা কিছু কথাকে প্রকাশ করা। ভগীরথের মন যেন ফল্গু ধারায় বলতে চায় মা তোমার কোন ভয় নেই, তুমি ভয় পেয় না। আমি আছি তোমার পাশে। তোমার সমস্ত ভয়ভীতিকে আমি নিজে আত্মস্ত করে তোমাকে মুক্ত করব এবং তৎসঙ্গে আমি আমার মাতৃ ঋনকে লাঘব করব। কিন্তু সমাজ দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া কুসংস্কারের বোঝা এতটাই বেশি যে শুধুমাত্র এই শিশুর দ্বারা এই বোঝা নামানো কষ্টকর। তাই তো ভগিরথের শিশু হৃদয় ভয় পায়। কেননা সমাজ তাকে বলে দিয়েছে, শিখিয়েছে,

> "উদ্ভ্রান্তের মতো ধান ক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের চষা দুপুরে লাল কাপড় পরে কে যেন কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে মজা পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর। বাঁয়েন যখন যায় তখন টিন বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যায়। বাঁয়েন যদি কোন ছোট ছেলে বা যুবা পুরুষকে দেখে, তখনই

চোখের দৃষ্টিতে তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে। .... হাট বাজারের ফুল, গোলাপ, মাখন বালার মতো নানা ছলা কলা জানে বাঁয়েন। যদি কোন ছোট ছেলেকে বাঁয়েন নিতে চায় সে যখন হেঁটে যাবে চারদিক রোদে পুরলেও তার মুখে ঠিক ছায়া থাকবে। অদৃশ্য হয়ে বাঁয়েন আচলের ছায়া ধরে ছেলেকে আড়াল করে নিয়ে যাবে।”[৭২]

মহাশ্বেতা দেবী প্রকৃত পক্ষে সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত কুসংস্কারের কথাকেই অধিক পরিমানে তুলে ধরেছেন। যে সংস্কারের দ্বারা পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নারীকে শাসন শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই কুসংস্কারের শিকার হয়েছে চন্ডী গঙ্গাপুত্র। কেননা চন্ডীকে বাঁয়েন বানানো হয় আর সমাজে প্রচার করা হয় চন্ডীকে বাঁয়েন ধরেছে,ওরভাগ্য ভালো যে তাকে ডায়েন ধরেনি। কারণ ‘বাঁয়েনকে মারতে নেই, বাঁয়েন মরলে গাঁয়ের ছেলে পিলে বাঁচে না। ডাইনে ধরলে পুড়িয়ে মারে, বাঁয়েন ধরলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।’ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এসব বিশ্বাস সমাজে শুধুমাত্র নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কোন পুরুষ বাঁয়েন বা ডায়েন হয় না। অসহায় নিরপরাধ নারীরা সমাজের দ্বারা চাপানো ক্ষমতা বা প্রতাপের কাছে হার মেনে এই সব আখ্যায় ভূষিত হয়ে নিজের জীবনকে সংকট সন্মুখীন করে তুলে। কিন্তু মাতা সন্তানের আদি ও অকৃত্রিম সম্পর্ককে সহজে মোছা যায় না তাই ভগিরথ তার মায়ের সঙ্গে দেখা করে। সে সমস্ত বাঁধা বিপত্তিকে লঙ্ঘন করে একলা চলে আসে মজা পুকুর ধারে তার মায়ের ছবিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য,

“জলে বাঁয়েনের ছায়া। বাঁয়েন ওকে দেখছে না। চোখ নিচু করে জল ভরছে মাটির কলসীতে।
তোমার আর কাপড় নাই।
বাঁয়েন চুপ, বাঁয়েন মুখ ফিরিয়ে আছে।
তুমি ভালো কাপড় পড়বে?
গঙ্গা পুত্রের বেটা ঘরে যায়,
আমি, আমি এখন স্কুলে পরি। আমি ভালো ছেলে।

মোক সঙ্গে কথা বুলে না রে। আমি বাঁয়েন।
আমি ছেঁয়াকে বলছি।
মোক ছেঁয়াতে পাপ আছে ই কথা গঙ্গা পুত্তের বেটা জানে না? আমার ভয় নাই,/ তুমি....একলা থাকতে ভয় পাও? একলা? নারে মোক কোন ভয় নাই। একলা থাকতে বাঁয়েন ডরে? তবে তুমি কাঁদ কেন ?
কে বুলে?
আমি শুনেছি।
গঙ্গা পুত্তের বেটা শুনেছে! আমি কাঁদি?
জলে লাল ছায়াটা কাপছে। বাঁয়েনের চোখে জল, বাঁয়েন চোখ মুছলো, বলল ঘরে যেয়ে গঙ্গা পুত্তের য্যান কিরে কাড়ে, বাঁয়েনের ধারে কুনদিন আসবে না, লয়তো.....লয়তো আমি গঙ্গাপুত্তরে বুলে দিব।"[৭৩]

লক্ষনীয় যে বাঁয়েন অসহায় অবস্থার কাছে, তাই সে নিজের মুখে সন্তানের সঙ্গে তার নিজস্ব সম্পর্ককে অস্বীকার করে যদি তাতে সন্তানের অমঙ্গল হয়। মাতৃত্বের এই করুন পরিহাস তো আমাদের পুরাণ সমর্থিত। মাকে দেবীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে সব প্রকৃত ভূমিকা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। একজন মাতৃ হৃদয় কে শিশু ভগিরথ যতটা চিনতে পেরেছে বুঝতে পেরেছে চন্ডীর স্বামী মলিন্দও তাকে ততটা চিনতে পারেনি। মলিন্দ নাম সই করতে পারায় লাশ ঘরে পারমানেন্ট চাকরি পায়। তা ছাড়াও চুন আর ব্লিচিং পাউডারে বেওরিশ লাশের কঙ্কাল বানিয়ে বিক্রি করে মোটা টাকা রোজগার করে। সে নিজেই ঘোষনা করে তার স্ত্রী চন্ডীর বাঁয়েনের কথা। আবার দ্বিতীয় স্ত্রীরও কোন অধিকারের সে রকম শক্তপোক্ত জোর থাকে না কেননা তার দ্বিতীয় স্ত্রী কোন পুত্র সন্তান জন্ম দেয়নি, দুটি কন্যা সন্তান ছাড়া। অর্থাৎ নারীর অস্তিত্ব পুরোপুরি ভাবে নির্ভর করে পুরুষের হাতে। তার পুরুষ সন্তান জন্ম দেওয়া না দেওয়ার উপর নির্ভর করে স্বামীর প্রতি অধিকার অনধিকারের বিষয় গুলি।

মহাশ্বেতা এই গল্পের মধ্যদিয়ে সমাজে নারীর প্রকৃত স্থান বর্তমানের সমাজ ও সংস্কৃতিতেও যে কত নীচে রয়েছে তা যেমন তুলে ধরেছেন আবার নারীরা যে অপয়া, ধ্বংসের কারণ নয়,তাদেরডাইন বা বাঁয়েন হওয়া যে সমাজ আরোপিত বিষয়, তারাও যে সমাজেরই অঙ্গ রক্তে মাংসে গড়া মানবী সে বার্তাই সাধারণ পাঠক বর্গের কাছে তুলে ধরেছেন। তাই চন্ডী রেল লাইনের সমস্ত ডাকাত দের তাড়িয়ে দিয়ে ট্রেনভর্তি যাত্রিকে প্রানে বাঁচিয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। চন্ডি এখানে নিজে মরে গেছে এবং সঙ্গে এটাও প্রমান করেগেছে যে সে বাঁয়েন নয়। সেও সমাজেরই একজন রক্ত মাংসে গড়া মানবী এবং একই সঙ্গে বহুগুন সম্পন্ন স্নেহময়ী জননী। তাইতো গল্পের শেষে ভগিরথ বলতে দ্বিধা করে না যে সে চন্ডীরই ঔরস জাত সন্তান। এবং একই সঙ্গে সমাজের সমস্ত স্বার্থ পরতা এবং ঘৃন্যতার দিকে আঙুল তুলে দিয়ে কদর্য দিকটিকে আরও বেশি ক্লেদাক্ত করে বি. ডি. ও. কে বলেছে,-

> "আমার নাম ভগিরথ গঙ্গাপুত্র বাপ পূজ্য মলিন্দর গঙ্গাপুত্র।
> নিবাস ডোম পাড়া। যা ঈশ্বর চন্ডী গঙ্গাদাসী ....."[৭৪]

চন্ডী এখানে মৃত্যু বরণ করে বটে কিন্তু নিজে মরে গেলেও বেঁচে থাকে ট্রেনের সেই সব প্রান ফিরে পাওয়া মানুষের মধ্যদিয়ে, সে যাদের প্রানে বাঁচিয়েছে। চন্ডী বেঁচে থাকে তার ছেলে ভগিরথের মধ্যদিয়ে, সমাজের মঙ্গলময়তার মধ্যদিয়ে। এবং সর্বোপরি এটাই প্রমানিত হয় যে, সে বাঁয়েন নয় মানুষও,সমাজই তাদের বাঁয়েন, ডায়েন, প্রভৃতিতে চিহ্নিত করে। নিজেদের স্বার্থ পুরণের জন্য। নারীকে সমাজের চোখে হেয় করে প্রতিপন্ন করার পিতৃতন্ত্রের এক অভিনব প্রয়াস। নারী সম্পর্কে সাধারণের চোখে ভীতি উৎপাদন করে তাদের মূল স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অঙ্গ এই ধরণের পরিচয়ে তাদের পরিচিত করা।

‘কুড়োনির বেটা’

প্রথম প্রকাশ: শারদীয় ‘অনুষ্টুপ’ ১৩৮৯/১৯৮২ খ্রী.

উচ্চশ্রেণির রাজনৈতিক এক নেতার দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত, অবহেলিত, অন্ত্যজ শ্রেণির লোধা সম্প্রদায়ের এক মা চরিত্রকে নিয়ে এই গল্পের কাহিনি শুরু ও শেষ। মহাশ্বেতা দেবী গোটা লোধা সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক সামাজিক পরিস্থিতিকে দেখাতে গিয়ে এই সম্প্রদায়ের মমতার আধার এক মা চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। জুড়নের মা কুড়োনি, স্বামী লোচন মারা যাওয়ার পর ছেলে জুড়নকে নিয়েই তার সমস্ত ভাবনা চিন্তা তাকে মানুষ করা। স্বামীর স্বপ্ন ছিল ছেলেকে পড়াশুনা করানো। তাই তাকে স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য আপ্রান চেষ্টা। তার মাথায় থাকে কাঠের বোঝা, পেট কোঁচড়ে থাকে তুঙ্গা আলু, হাতে হাতখন্তা ও দা। পরাক্রান্ত পরিশ্রমি কুড়োনি বলে,

> “দা দিয়ে কাঠ কাটি, খন্তাদিয়ে তুঙ্গা আলু খুড়ে তুলি। এছাড়াও কাঁটা আলু, চুন আলু, পান আলু, চুরকা আলু, যখন যা পাই। বাউলা আনব, ঘরে ঘরে বেচব। কেঁদ, ভুররু, ভুই কুমড়া, বেঁইচি, কুল, সেয়াকুল, বদাকুল, পিয়াল, আমলকী, যখন যা ফল পাব তা আনব।”[৭৫]

লোধা সম্প্রদায়ের মানুষেরা কখনো কোন অন্যায় উপায়ে জীবিকা অর্জন করে না। বনে জঙ্গলে যা পায় শিকার করে নিয়ে আসে এবং তা দিয়েই নিজেই জীবন অতিবাহিত করে। দু:খ কষ্টে জীবন যাপন করে এরা। কিন্তু এখন তাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন এরা জঙ্গলে যেতে পারে না। জঙ্গলে গার্ড থাকে। তাছাড়া যে কোন লোধা সম্প্রদায়ের মানুষকে যে কোন অপবাদ দিয়ে মেরে ফেললে কিছু হয় না। তাদের কোন বিচার হয় না। বেশির ভাগ সময় মিথ্যে চুরির দায় দিয়ে মেরে ফেলা হয়। কুড়োনির

স্বামীকেও মিথ্যে চুরির দায়ে মেরে ফেলা হয়। বিভিন্ন কৌশলে তাদের জমি দখল করা হয়। সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয় গুলি থেকে এই সম্প্রদায় ভুক্ত লোকগুলিকে পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হয়েছে। কুড়োনি বিয়ের আগে গান গেয়েছিল,

> "পাহাড়ে পর্বতে যামু আলু তুঙ্গা খামু, যাহার দেখমু খন্তা
> কোদাল তাহার সঙ্গে যামু। মারিব সাবলের গুতাঁ আলু তুঙ্গা
> বার করামু, আলু তুঙ্গা খামুরে পাহাড় পর্বত যামুরে....."[৭৬]

আজ আর খন্তা ও কোদাল দেখেই লোধা সম্প্রদায়ের মেয়েরা পিছু নিতে পারে না। কেননা এখন আর বন জঙ্গলে কন্দমূল, ফল থাকে না। সংরক্ষিত বনাঞ্চল সরকারের প্রতাপে সব হাত ছাড়া হয়েছে এই সম্প্রদায়ের হাত থেকে। এখন জমিদার, জোতদার, মহাজন শ্রেণির হাতেই সব চলে গেছে। সরকারী অনুমোদন যতটুকু আসে এই সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য তার পরিবর্তে জোতদারের ঘর জমি, বাড়ি বৃদ্ধি হয় তাদের ক্ষমতার উন্নয়ন হয় কিন্তু এদের কোন উন্নয়ন হয় না। লোধা সম্প্রদায়ের শুধু যে ক্ষমতা চ্যুত করেছে তা নয় এদের শোষনও করা হয় বিভিন্ন কৌশলে। যেমন মহাপাত্র বাবু কুড়োনির ছেলেটাকে নিজের কাজের প্রয়োজনে সুকৌশলে বলে,

> "দে তোর ছেলে টাকে দে। ঘরের ছেলের মতো থাকবে।
> মাসে তিন টাকা মাইনে সকালে জল খাই দুপুরে ভাত,
> বছরে একটা পেন্ট,একটা গামছা।"[৭৭]

এই শ্রেণির লোকেরা যখন কোন কাজে লাগে তখন কোমর বেধেই লেগে যায়। যাতে করে সে কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে না আসে। আর সে কারনই দুইদিক থেকেই জাল বিছিয়ে রাখে যাতে করে ওরা আসতে না চাইলেও আসতে বাধ্য হয়ে। তাইতো বাবু বলে,

> "তোর বাস্তু লোচন বেচে গিছে সনাতনের কাছে। আমি বলি, দখল নিয় না। সামান্য আড়াইশো টাকা, সে আমি দিয়ে দেব। .....তিন টাকা ধর আমি দিয়ে দিলাম।"[৭৮]

স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই কথার আড়ালে রয়েছে এক বড়সর ধরনের ধুমকি। অথাৎ যদি কুড়োনি তার ছেলেকে বাবুর বাড়িতে কাজে না পাঠায় তাহলে তার ঘর বাড়ি যতটুকু আছে বাস্তু জমি সবটুকু দখল করবে সনাতন আর তারা হবে বাস্তুহীন। তাইতো এই আড়াইশো টাকার বিনিময়ে কুঁড়োনিও বাবুর বাড়িতে হবে ভাতুয়া। মহাশ্বেতা বাবুর শ্রীকৃষ্ণ রূপটিকে উল্লেখ করতে গিয়ে কুড়োনির রূপ চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

> "লোধা মেয়েরা দেখতে ভালো। কুড়োনি বরাবরই সুদর্শনা। এত দু:খেও ওর চেহারা প্রতিশ্রুতি পুর্ণ। বোঝাই যায় সে খেলে মাখলে চেহারা দলমলে হবে। বাবুর ভাতুয়া রাখার প্রস্তাবটি সেই জন্যেই।"[৭৯]

এই গল্পে কুড়োনির প্রথম অপরাধ সে লোধা সম্প্রদায়ের অন্ত্যজ শ্রেণির একজন। দ্বিতীয় অপরাধ সে একজন সুন্দরী নারী। তার শরীর, রূপ স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি কাজ করার ক্ষমতা তাকে শোষণ করার জন্য যথেষ্ট প্রামান্য উপকরণ। এদের নিজস্বতা এবং স্বাধীনতা বলে কিছু থাকেনা। লোধাদের মা, বাপ, ভাই, বোন,বউ বলে কিছু থাকে না। এদের সমস্ত কিছু বাবুদের জন্য। তাইতো লোধা মারাগেলে বা মেরে ফেললে কোন বিচার হয় না। সমস্ত কিছু স্বাভাবিক থাকে। লোধা মরলে কখনো কোন খুনিকে ধরা হয় না। লেখিকা সে কথাই যেন বলেছেন, 'লোচনের মতো চেনা জানা নিরিহ মানুষকে পিটিয়ে মারার পরও তার যুবতি বউকে ভাতুয়া থাকার কথা বলা যায়। লোধাদের সব কিছুইতো বাবুদের।'[৮০] এই বাবুদের ছল চাতুরি বুঝেছে কুড়োনি। কেননা কুড়োনিকে কব্জা করার জন্যই বাবু ছল করে সনাতনকে লোচনের জমির বর্গাদার বানায়। সনাতন জমির ভাগ পায় না। সেও এই লোধাদেরই একজন, তাকে শুধুমাত্র হাতিয়ার বানিয়েছে বাবু। বাবু যা বলে

তাই করে এবং তাই হয়। এদের সামনে কোন সরকারী আইন কানুন ঠাই পায় না। তাদের জীবনে বাবুর কথাই শেষ কথা। এই বাবুরাই জমিদার, জোতদার, মহাজন আবার এই বাবুই পঞ্চায়েত। এরাই সব কিছু পরিচালনার দায়িত্বের মূলে থাকে। তাইতো এই বর্বরতার শিকার এই শ্রেণির মানুষেরা। কেননা এরা সর্বদাই নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই সমস্ত আইন কানুনের ফাঁক ফারাক নির্মান করে। মুখে বড় বড় কথা বলে দেশের কথা, দশের কথা কিন্তু অন্তরে লুকিয়ে থাকে সেই আদিম প্রবৃত্তি গুলি। যা তাদের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়,

> "আমরা হলাম নতুন দিনের মানুষ। হাঁ ! এ রাজ্যে ভেদাভেদ রাখব না। কিন্তু অন্তরে তো মায়েদের রাজত্ব। সেখানে আমাদের কিছু করার নেই। এ রাজ্যে আমরা। যখন এসেছি তখন ভেদাভেদ রাখব না।"[৮১]

মায়েদের রাজত্বে নিষেধের টান রাখলে যে তাদের রাখনি করা যাবে না। আর যাদের রাজত্বের কথা বলাহচ্ছে তারাও তো সেই রাজত্বের নামহীন বর্গাহীন প্রজা মাত্র। এই হল তাদের সুখের কথা, কিন্তু বাস্তবে এই বাবুরা অন্ত্যজশ্রেণির লোধাদের কুয়োর জল খেতে দেয় না। এদের ছোঁয়া যায় না। এরা নিচু জাত। এদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়তে পারে না। আর মুখে যে রাজ্যকে মায়েদের রাজ্য বলে বাস্তবে ঠিক বিপরীতটাই লক্ষ করা যায়। কেননা এই বাবুরই তিন জন মা, তার মধ্যে সবার ছোটমায়ের বয়স তার নিজের বয়সের সমান। এই হচ্ছে এদেশীয় সংস্কৃতির স্মৃতি শাসনের বিধি নিষেধের ফলে গড়ে ওঠা প্রকৃত রূপ। এখানে নারীর জন্য মায়ের জন্য সংবিধানে উল্লেখিত বহু ধারা নির্মান করলেও বাস্তবে তার কানাকড়িও প্রয়োগ হয় না। তাইতো নিজের সেই করুন পরিনতির কথা বলতে গিয়ে কুড়নি বলে,

> "যত দেশে চুরি হয়, সব লোধা করে? লোধা পায় কানাকড়ি, মার খেয়ে মরে। লোধা ঘর হবে বলে টাকা, লোধাদের ছাগল দিবে বলে টাকা, লোধাদের চাষিবাসী করবে বলে

> টাকা! লোধার কপালে কিছু হয় না, বাবুদের দালান কোঠা,দোকান পাঠ, ক্ষেত খামার হয়। না লোধা পায় না হে কিছু জুড়নের বাব! ..... লেঙ্গামারা গ্রামে যেতাম মাসির বাড়ি তারা যে ডোবায় বাসন মাজে, তাতে শুয়োর অব্দি নামতে ঘেন্না করে।”[৮২]

এমনি বসবাসের অযোগ্য পরিবেশে লোধারা জীবন যাপনে অভ্যস্থ। এই গোটা সম্প্রদায়ের মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করে আসছে আজীবন মানুষ। এখনো এদের জীবন ধারার কোন পরিবর্তন নেই। জুড়নকে ভীষণ ভাবে খাটায় বাবুরা, তা দেখে কুড়োনির মাতৃ হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয় দু:খ কষ্টে। বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণ কুড়োনির বুক ফেটে যায় কিন্তু কিছু করার থাকে না বাবুদের বিরুদ্ধে। শুধু কুড়োনির নয় গোটা সমাজের মায়েদেরই এই একই জ্বালা যন্ত্রনায় অতিবাহিত করতে হয় জীবন। কুড়োনি নিজের সন্তানের দু:খ সহ্য করতে পারেনি। তাই সে জুড়নকে ফিরিয়ে আনতে চায়। সে জুড়নকে স্কুলে পড়াবে। তাকে শিক্ষিত করবে। আর এই কথাগুলোকে বাবুরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। কেননা এই ইচ্ছা গুলো হচ্ছে আগামী দিনের এক ধরনের প্রস্তুতি। এই ইচ্ছাগুলোকেই তো স্বমূলে বিনাশ করতে হবে। তাদের বাড়তে দেওয়া মানেই নিজেদের মৃত্যুকূপ নিজেই তৈরি করা। সুতরাং তাকে আটকে রাখতে হবে তাইতো শুরু করে বহুমুখি ভাবনাচিন্তা,

> “এক, জুড়ন তার কাছে আটকা থাকলে কুড়নিও থাকে ছেলের কারনে আবদ্ধ। দুই, জুড়ন ছোট্ট ছেলে কিন্তু লোচনের যোগ্য সন্তান। তার কাজের হাত খুবই ভালো। এই ময়দান সদৃশ উঠোন জুড়ন ঝাট ও গবর ঝাটায় চমৎকার করে। বাগানের আগাছা তুলে নির্মূল করে। তিন, কুড়োনি জুড়নকে নিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করার মধ্যে কোথাও একটা স্বাধীন ভাব কাজ করার ব্যপার আছে। এটিতেই বাবুর মুখ্য আপত্তি।”[৮৩]

কেননা নিচু শ্রেণির মানুষেরা স্বাধীন হলে বাবুদের স্বার্থের বেঘাত ঘটবে। তাইতো এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যাওয়া বাবুদের এক নৈতিক কর্তব্য। এই নৈতিক কর্তব্য পালন করতেই বাবুরা প্রতিবাদী মানুষদের মূল মেরুদন্ডই খতম করতে চায়। কাউকে চোর অপবাদদিয়ে ধরে বেঁধে মেরে ফেলে, কাউকে লুচ্ছা, শয়তান, জানোয়ার প্রভৃতির মধ্যদিয়ে চলে খুন রাহামারি, ধর্ষণ, ভয় দেখানো এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করার ধমকি। তাই তো দশ বছরের জুড়ন ক্রুদ্ধ কান্নার মধ্যদিয়ে বলে দেয়,

> "সকল লোধাদের এনে দিই, সকলেরে কেটে ফেল, বাবুরা ! শান্তিতে থাক। লোধাদের আজ একটা, কাল দশটা, পরশু ছয়টা, খেপে খেপে মারতে হবে না। সকলেরে মার, মেরে শান্তিতে থাক।"[৮৪]

জুড়নের এই আত্মদহন ক্লিষ্ট কান্না শুধুমাত্র কান্না নয় এর অন্তরালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের অভিশপ্ত ছবিও। ভারতবর্ষের আদি অকৃত্রিম অধিবাসী যারা, ইতিহাসে তাদের কোনো পরিসংখ্যান নির্মিত হয় না। তাই বাবু সম্প্রদায়ের লোভের আগুনেই তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেলে গেলে একদিন এই নিরীহ মানুষ গুলোও গর্জে উঠে। যা আগামী দিনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর প্রস্তুতি বলা চলে। সে প্রতিবাদ আরও প্রখর হয় যখন বাবু জুড়নকে মারে। জুড়নকে মারার কথা শুনে গর্জে ওঠে কুড়নি। বাবু, জোতদার, মহাজন, মালিক সমস্তকিছুকে অতিক্রম করে যখন বলে,

> "শঙ্কায় ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো বাবু! তুমি আমার স্বামী নিয়েছ, ছেলেকেও নিবে? কাঠারি তুলে তোমারে কাটবো বাবু। কেটে ফাঁসি যাব। কুড়োনি বাতাসের আগে ছুটে, চিলনি মায়ের মতো ডানা ঝাপটে চিৎকারে সে চেচায়, জুড়নরে! চরণ বাবু গ্রামে এল, তবুতোরে ছেরে দিবে না।"[৮৫]

একজন মায়ের অন্তর্দহনের বেদনা যেন বলে দেয় এই অভিশাপে বিদ্ধ করতে থাকে। যদিও বাবুর ছলা কলার হিসেব মিলানো একমাত্র সম্ভব নিজেকে শেষ করে বাবুর ভোগ্যপন্যে নিমজ্জিত হওয়া। বাবুর এই মূলমন্ত্র কুড়োনি অনেক আগেই বুঝে গেছে। তাইতো সর্বসম্মুখে বলে দেয় কুড়োনি,

> "জুড়নের বাপ নাকি সনাতনের কাছে বাস্তু বেচে আড়াইশো টাকা নিয়েছিল। বাবু দয়ার সাগর। সে সেই টাকা শোধ দিয়েছে। তাতেই আমাকে ওর পাট গোহাল করতে হবে।.....কুড়োনি তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলে, জুড়নের বাপ আড়াইশো টাকা পেল, আমি জানি না ? সনাতনকে সুধাই। সে বলে, বাবু আমার নামে বর্গা রেকর্ড করায় আমি কাগজে বর্গাই। তা জুড়নের মা! আদিবাসী লোধার বাস্তু তো বাবু নিতে পারে না। তাতে আদিবাসী আমার নাম দিতে পারে। যে নিলে সে জানলো না, যে কিনলো সে জানলো না, জানলো একা বাবু। তাহলে বুঝে দেখ।"[৮৬]

অবশেষে কুড়োনি তার ছেলে জুড়নকে মুক্ত করে বাবুর হাত থেকে। তাকে চরনের স্কুলে ভর্তি করে দেয়।এখানে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী সমাজ জীবনের প্রতি শোষণের বহুমাত্রিক দিক গুলিকে দেখিয়ে দিয়েছেন। সে সঙ্গে একজন নি:স্বরনারীর প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে উঠে আসে আমাদের কাছে কুড়োনি চরিত্রটি। যা সামাজিক বাস্তবিক ও রাজনৈতিক ঘেরা টোপকে অতিক্রম করে নিজের জীবনকে এবং সন্তানকে একই সঙ্গে রক্ষা করেছে নররূপী রাক্ষসদের হাত থেকে। এই দিক থেকে কুড়োনি চরিত্রটি একজন মায়া-মমতাময়ী মা হিসেবে পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠেছে। এবং নিষ্পেষিত লোধা সমাজের ধীরে ধীরে ক্ষোভের ত্বরান্বিত তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠেছে তারও ঈঙ্গিত দিয়েছেন

চিরকাল অবস্থা এক থাকে না, এদের নিরুচ্চার ক্ষোভ মিলে মিশেইতো একদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে। পুড়বে রাজপাট, হারজীর্ণ মানুষগুলো তাদের বাঁচার লড়াই করবে।

'চিন্তা'

প্রথম প্রকাশ : অজ্ঞাত। পুনর্মুদ্রন: মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠগল্প, 'প্রমা'১৩৯১/১৯৮৪ খ্রী.

মহাশ্বেতা দেবী বাস্তবতার উপকরণ গুলিকে সংগ্রহ করেই তার গল্পের কাহিনি রচনা করেন। আলোচ্য গল্পেও এরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তাছাড়া মহাশ্বেতা নিজেও সে কথাই বলেছেন,

> "আমি বিশ্বাস করি, ইতিহাস চেতনা (গল্প লেখকের ক্ষেত্রে) এমন হওয়া বাঞ্চনীয়, যা বর্তমান সময়কে বুঝতে সহায়তা করবে। শিল্পের জন্য শিল্প করার ক্ষমতা বা স্বাদ আমার ছিল না, করিনি। যেহেতু অন্যকিছু কাজের কাজ করতে শিখিনি, তাই পারি না পারি লিখে গেছি। অবিচার ও শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানার জন্য যথার্থ দলিলি করনকেই যোগ্যতম মাধ্যম মনে করেছি। দুই একটি গল্পের কি ও কেন পাঠকের কাচে রাখছি। চিন্তা গল্পের ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখেছিলাম।"[৮৭]

'চিন্তা' গল্পের চিন্তাকে আমরা যে অবস্থায় দেখতে পাই এবং তার শেষ পরিনতিতে যে চিত্র পরিলক্ষিত হয় তাতে এই কাহিনির সমাজগত বাস্তবতা সহজেই প্রমানিত হয়। কেননা আজও সমাজে বহু মেয়ে বা নারী বিয়ে নামক খেলার ছলে পরে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে ভদ্র মানুষের মুখোশে ধূর্তবাজ শয়তানদের কবলে। এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। আলোচ্য গল্পের চিন্তাও একই রকমভাবে সামাজিক বিধির শিকার। সে উৎসবের প্রেমে পড়ে দুটি ছোট কন্যা সন্তানকে নিয়ে পড়ে যায় বিপাকে। যে

উৎসবকে স্বামী বা পতি দেবতা বলে মনে করে সেই তার সমস্ত কিছু বিক্রি করে পথের ভিখারি করে এবং কোলে দুটি সন্তানকে রেখে পালিয়ে যায়। ফলে চিন্তা বিপদ থেকে আরও বিপদতর পর্যায়ে চলে যায়। সে মানুষের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে কোলের মেয়ের কোমড়ে গরু ছাগলের মতো রশি দিয়ে বেঁধে অন্যের বাড়ির বাসন মাজে। বিনিময়ে যে আটটি টাকা পায় তা দিয়ে ওর সংসার চলে না। অপরদিকে শয়তানি মানুষের অভাব নেই এই সংসারে। সে বেহারি পানওয়ালীর শয়তানি অশ্লীল দৃষ্টিতে ধরা পরে যায়। বাসি ভাত পুরনো ময়লা কাপড়ই হচ্ছে চিন্তার বুকের হাড়। এই দিয়েই সে নিজে চলে এবং তিনটি সন্তানকে চালায়। অতিকষ্টে জীবন যাপন করে। মালিক তার বেতন কম দেয়। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে না।'সব অবস্থাতেই প্রতিবাদহীন জন্তুরমতো সহ্যশীল আর নীরব।' একদিন তার উপর লাফিয়ে পরে সেই পানওয়ালা, -

> "রাত বারটায় কাজ ছেড়ে ঘরে ফিরতে – মদ না খেয়ে ঠান্ডা মাথারই পানওয়ালাটা ওকে জাপটাতে গিয়ে কাপড় খানা ছিড়ে দিয়ে চটচটে হেঁসে চেচিয়ে গান ধরে। সকালে মেয়েটার হাত থেকে রুটি বিস্কুট বাড়িওয়ালার বউয়ের নদ পরানো কাকটা ছিনিয়ে নেয়।....."[৮৮]

চিন্তা বুঝে পানওয়ালা অশ্লীলভাবে তার সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে চায়। কিন্তু চিন্তার ভাবুক মন, সেদিকে সায় দেয় না। সে পাপকে ভয় পায়। তাইতো দূর্বার শরীর যৌবনের জ্বালার অভিশাপ নিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে চিন্তা। যে চিন্তা পাপের ভয়কে তাড়িয়ে দিয়ে সময়ে অসময়ে নিজের সমস্ত কিছুকে গুছিয়ে নিতে পারত তথাপি সেই পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। আজ সেই চিন্তা নিজের দুটি কন্যা সন্তানকে আট ও দশ টাকায় বিক্রি করে দেয়। এখন আর চিন্তার সেই অসহায় অবস্থা নেই। সে ভালো কাপড় পড়ে। কালো ভুরুর মাঝখানে টিপ পড়ে, চোখে জল ঝরতে থাকে এবং এমতাবস্থায় বলে, 'গরীবের ভগবান নেই গো মা-গরীবের ভগবান নেই।' গল্পের অন্তিমে লেখিকা নিজেই বর্ণনা করেন চিন্তার শেষ যাত্রার,

> "যার ভগবান নাই তার কেউ নাই – এই শেষ কথা বলে চলে যায় চিন্তা। রাস্তাটা পেরয়। দুপাশে দুটো লোক চলে। ছেলেটা বুড়োটার হাত ধরে চলে। এবার তার বিয়ে হবে। কন্যাপক্ষ যে টাকা দিবে তার থেকেই প্রায়শ্চিত্ত, বা এ টাকার থেকে ও টাকা মিলে জুলে জোড়া তালি দিয়ে যা হয় একটা হয়ে যাবে চিন্তার কপালে এই নিয়ে চিন্তা ছাড়া আর তিন জন আলোচনা করে।"[৮৯]

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও রাজনীতির শোষণের চাপে চিন্তা বাধ্য হয় দুটি কন্যা সন্তানকে অন্যের কাছে বিক্রি করতে। কেননা সমাজে উঠতে গেলে তার যে জরিমানার দরকার সে টাকার প্রয়োজন মিটিয়েছে সন্তান বিক্রি করার টাকায়। চিন্তা উঠে যায় সমাজে ঠিকই কিন্তু তার হৃদয়ের শূন্যতা তাতে ঘুচবে কী, তাতে সংশয় থেকে যায়। এভাবে মহাশ্বেতা পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একপেশে দিকটিকেই যেন উল্লেখ করেছেন না বলা কিছু কথার মধ্যদিয়ে। কেননা সমাজে উঠতে গেলে শুধুমাত্র মেয়েদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় কোন পুরুষকে নয়। যে লোকটির কারনে চিন্তার এই করুন পরিনতি সে বেকসুর খালাস পায় সমাজের শাসন ব্যবস্থার কাছে। যে পানওয়ালা রাত দুপুরে একজন অসহায় নারীর উপর ঝাপিয়ে পরে তার লালসা চরিতার্থ করতে চায় তাঁর কোন বিচার হয় না। কোন প্রায়শ্চিত্ত হয় না, কোন অন্যায়ও হয় না। সমস্ত অন্যায় যেন চিন্তার মতো অসহায় ঘর বাড়ি হীন, স্বজন হীন, অন্ন- বস্ত্র হীন নি:স্ব নারী দের। এভাবেই মহাশ্বেতা নারীদের আবহমান কাল ধরে চলা আসা বাস্তবতার রূপটিকেই তুলে ধরেছেন। তাছাড়া যে প্রশ্নটি এর আগে আলোচিত একটি গল্পের নিরিখে উঠে এসেছে অর্থাৎ মাতৃত্ব না জীবন কোনটা অসহায় নারীর কাছে আগের দাবী এই গল্পটির প্রেক্ষাপট সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটা প্রয়াস।

‘ধৌলী’

প্রথম প্রকাশ : ‘অমৃত পত্রিকা’ প্রকাশকাল অজ্ঞাত

‘ধৌলী’ গল্পও এক অসহায় নারীর জীবন বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ। সৎচরিত্র বান নারী ধৌলী স্বামীর মৃত্যুর পর কখনো কোন পুরুষকে সে আমল দেয়নি। শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে আসে তার ওপর ভাশুরের কুদৃষ্টি পড়ায়। সে বুঝতে পেরেছে শ্বশুর বাড়িতে থাকলেও যেমন কাজ করে খেতে হবে মায়ের কাছে এলেও কাজ করে খেতে হবে। আবার ভাশুরকে বিয়ে করলেও তাকে সেই খেটেই খেতে হবে। তাইতো সে মায়ের কাছে চলে আসে ছাগল চড়ায়। জমিদারের ছেলে মিশ্রিলালের ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল। সুকুমার সুন্দর মুখ এবং সকরুন প্রেম নিবেদন ধৌলীর কমল হৃদয়ে স্থান করেছে। গাল ভরা প্রতিশ্রুতি এবং হৃদয় ভরা আর্তি ধৌলীর কাছে মিশ্রলালকে সুলভ করেছে। যার ফল স্বরূপ ধৌলী হয়েছে মিশ্র লালের সন্তানের মা। মিশ্রলাল অন্য জায়গায় বিয়ে করে দোকান করে সুখে জীবন যাপন করে আর ধৌলী স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে দূরে সরে গিয়ে মিশ্র লালের সন্তান কে লালন পালন করতে অসুমার দারিদ্র এবং কলঙ্কের লড়াইয়ে জড়িয়ে পরে অভাবের সঙ্গে। এই মিশ্রলালই তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,

> “জোর করে ওকে পাথরে বসায় মিশ্র লাল দু হাতে ওর মুখ তুলে ধরে ও বলে এক মাস চুপ করে থাক সাদীর জন্যে জোর করলে মানবি না, এ বলে দিয়েছি, ওরাও মেনে নিয়েছে। পরে ভুলে যাবে। নানা শোন, আমি একমাস হতেই

> ফিরে আসবো। এক মাসের মধ্যে কোথায় যাব কি করব, ঠিক করে নেব। আমি লিখাই পরাই নই। ভাল নোকরি চাই না। বড় ভাইও নই যে খেতি ঔর বাগান চাইব। কোথাও চলে যাব, দোকান দেব। ব্যবস্থা করতে তো হবে?”[৯০]

এই হল নারী ভুলানোর পিতৃতান্ত্রিক এক কৌশল। মিথ্যে প্রতারণা, প্ররোচনা এবং মিথ্যে স্বপ্নের বেড়া জালে আবদ্ধ রেখে মিশ্র লালের মতো উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা যে বহু অসহায় নারীর জীবন নষ্ট করে ছেড়ে দিয়েছে তার প্রকৃত সংখ্যা হিসেব করেও বের করা সম্ভব হবে না। কেননা এদের চরিত্র বৈশিষ্টটাই এরকম, এ কথাই বলেছেন লেখিকা ধৌলির সম্পর্কে,

> “ধৌলী সবই জানছিল। ও প্রতিবাদ জানাবার কথা ভুলেও ভাবেনি। দুসাধ মেয়েকে ব্রাহ্মনের ছেলেকি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিচারে সব দোষই ধৌলীর এতে প্রেম ভালোবাসার ব্যপার থাকায় ধৌলী স্ব-সমাজের কাছেও ব্রাত্য। স্ব- সমাজের ছেলেদের সে আমল দেয়নি। নাদিক। মিশ্র লাল ওকে জোর খাটিয়ে নষ্ট করলে দুসাদরা ওকে ফেলতো না। মিশ্র বাড়ির ছেলেদের জারজ সন্তান দুসাদ – গঞ্জু ধৌবি টলিতে অনেক থাকে। এ ক্ষেত্রে ধৌলী স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেছে। অমার্জনীয় অপরাধ -.....। কোন কোন সময়ে মিশ্ররা জারজ সন্তানদের জননীদের কাজ বা মারোয়া বা পয়সা দিয়ে আরক্ষা দেয়। উক্ত পর্যায়ের জননীদের ও তাদের অবৈধ সন্তানদের গ্রাম সমাজও খাতির করে। কেননা অন্যথায় মিশ্ররা চটবে। আর মিশ্ররা চটলে কারো রক্ষা থাকে না।”[৯১]

ক্ষমতা বা প্রতাপের দ্বারা অন্ত্যজ মানুষকে পদদলিত করে রাখার ধারাবাহিক রীতি আদিম যুগ থেকেই হয়ে এসেছে। আলোচ্য গল্পেও এর কোন বিকল্প নেই। এই পথে অভ্যস্ত হয়ে পড়া ছাড়া তারা প্রতিবাদের বিকল্প পদ জানে না, জীবনের স্বাভবিকতাকে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে সর্বস্ব হারায়। এই কথাই দেখাতে চেয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী মিশ্রলাল চরিত্রটির মধ্যদিয়ে ধৌলীর জীবন যাপন পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে।

শিশু সন্তানকে নিয়ে অন্নবস্ত্রহীন ধৌলী আত্ম হত্যা করতে চায়। কিন্তু পারেনি, তার মাতৃহৃদয় প্রতিবাদের আগুনে জ্বলে ওঠে। সে বুঝতে পেরেছে নিম্নশ্রেণির মানুষের ভালোবাসার মূল অর্থ কি হতে পারে। তাইতো মিশ্রলালকে বলতে পেরেছে,-

> "থু! তোমার ভালো বাসায় থু! যদি জোর করে ধর্মনাশ করতে, এক বিঘে জমি পেতাম তুমি লা মরদ, তোমার দাদা মরদ বাচ্চা। সে ঝালোকে ছেলে দিয়েছে ঔর ঘর – মাকান – খেতি ভি দিল। তুই কি করলি?..... পরের ইচ্ছায় সাদি করতে পার, দুকান লিতে পার, নিজের ইচ্ছায় পার শুধু গরীবকে জানে মারতে ? তোমার জন্যে আমার গ্রাম সমাজও গুসসা হয়েগেল।"[৯২]

নারীর জন্য একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শোষন ও নির্যাতন আবার জমিদারির ক্ষমতা প্রতাপের দ্বারা শোষণ ও শাসন। তাইতো ধৌলি বুঝতে পারে সমাজে বসবাস করে স্বচ্ছল ভাবে চলতে গেলে তাকে হতে হবে সবার চেয়ে বড়

রেন্ডী।নয়তোসারাটাজীবনশুধুকলঙ্কিতহয়েইথাকতেহবে।এরকোনপ্রতিকারহবেনা।আবারঅভাবকেওদূরকরতেপারবেনা।তাইতোধৌলৌসমাজেরসেইনোংরাবেশ্যাবৃত্তিকেইজীবিকাহিসেবেগ্রহনকরে। সারারাত ধরে ঘরে ঢেলা পরে একের পর এক। আর আসতে থাকে একের পর এক তার জীবিকা নির্বাহের উপকরণ চাল, ডাল,তেল, নুন, কাপড়, পয়সা, এখন আর ধৌলীর কোন অভাব নেই। কিন্তু ধৌলীকে এই স্বচ্ছলভাবে থাকতে দেখলেও সমাজ মেনে

নিতে পারে না। যাদের জন্য তাদের এই করুন ব্যবসায় নামতে হয় তাদের কোন অপরাধ হয় না। এই অপরাধীরাই আবার সমাজের শাসক। তাইতো ধৌলীকে গ্রাম ছাড়তে হবে। কেননা এরা সমাজের সবচেয়ে দোষী মানুষ শাসকের চোখে। এদের কারনে সমাজ আরো বেশি দুষিত হতে পারে। তাইতো দূষন মুক্ত সমাজ গড়তে হবে। আর এই দূষন মুক্ত সমাজ গড়তে ধৌলীকে যেতে হবে শহরের ঐ অন্ধ গলির কোঠায়। যেখানে কোন পাপ অধর্মের হিসাব হয় না, যদিও এই সমাজ কর্তারাই এই পাপ ধর্মের হোতা হন। মহাশ্বেতাও এ কথাই বলতে চেয়েছেন,

> "মা ফুপরে কেঁদে ওঠে। এর চেয় বড় ভাশুরের সঙ্গে থাকলিনা কেন? ধৌলীর মধ্যে এক দুর্বধ্য করুনার হাসি ফুটে ওঠে। সেরকম হলে সে হত ব্যক্তি জীবনের রান্ডী। এখন সে বেওসা রান্ডী হতে যাচ্ছে। তেমন রান্ডী একলা মানুষ। এখন সে যে রান্ডী হবে তা হবে তা এক সমাজের সদস্য। ব্যক্তির চেয়ে সমাজের শক্তি অনেক বেশি, আর যারা তাকে রান্ডী করেছিল, তারাই সকল সমাজ চালায়। সবচেয়ে শক্তিমান তারা।"[৯৩]

ধৌলী বুঝতে পেরেছে শহরের অন্ধগলিতে রেন্ডি হয়ে থাকা আর কোন একক ব্যক্তি পুরুষের স্ত্রী হয়ে থাকা একই কথা। অর্থাৎ শহরের অন্ধ কোঠায় সবার জন্য দরজা খোলা থাকে আর একক ব্যক্তি পুরুষের সঙ্গে একজন পুরুষের জন্য দরজা খোলা রাখতে হয়। শোষণমাত্রার দিক থেকে উভয় কাজেই শোষণ পদ্ধতি একই। কেননা একক ব্যক্তির কাছে থাকলে তার সহযোগি হয়ে চির জীবন ধর্ষিত ও নির্যাতিত হয়ে থাকতে হয়। একারনেই বোধয় ধৌলী এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এবং মহাশ্বেতাও পরম দরদে এই চরিত্র টিকে বাস্তব প্রানবন্ত এবং জীবন্ত করে তুলে। কেননা তাঁর বক্তব্যের তীব্রতা যেন আমাদের মর্মে হুল ফোঁটায়। ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির শক্তি বেশি। আমাদের সমাজ গড়ার মূলমন্ত্র কিন্তু এটাই। তাই ধৌলীও কারো ব্যক্তিগত রক্ষিতা না হয়ে রান্ডী সমাজের সদস্য হওয়ার কথা বলে। সে পরিচয়ে মর্যাদা না থাকলেও স্বাধীন অস্তিত্বের বোধ রয়েছে।

এভাবেই ধৌলী বোধয় আর পাঁচ জনের সঙ্গে নিজের পরিচয় বিনিময়ে দশজনের একজন হয়ে উঠতে চাইছে সম্ভাব্য কোন প্রতিবাদের ঈশারা দিয়ে।

গিরিবালা

'প্রসাদ' ১৩৮৯/১৯৮২ খ্রী.

'গিরিবালা' গল্পটিতে মহাশ্বেতা দেবী একজন অসহায় মায়ের কন্যা সন্তান বিক্রয়ের কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে সমাজ কর্তৃক নারীর মূল অবস্থান এবং মায়ামমতা ও দয়াহীন এক আসুরিক পিতার নিষ্ঠুর মানবিকতা ও সর্বোপরি প্রতিবাদী এক নারীর জীবন কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। গল্পে গিরিবালা বিয়ে করে ভব ঘুরে এক বাউন্ডুলে আউল চাঁদকে। আউল চাঁদের কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। সে মেলায় মেলায় গান গায় এবং অবসর সময়টুকু বাবুদের বাইরের একটি কুড়ে ঘরে দিন যাপন করে। এই একই ঘরে দিন যাপন করে গিরিবালা। স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ককে বজায় রাখতে গিয়ে গিরিবালা চারটি সন্তানের মা হয় (বেলা,পরি, রাজীব ও মরুনি)। অভাবের সংসার গিরির। ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে গিরির ভাবনা চিন্তার শেষ নেই। সে দিন রাত পরিশ্রম করে। নিজের একটুকরো জমি, নিজস্ব দুটি ঘর এবং ধীরে ধীরে বড় মেয়ে বেলা বড় হলে তাকে একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেবে এই চিন্তা ভাবনায় মত্ত গিরি। আউল চাঁদের ক্ষমতা নেই যে সমস্ত মেয়ে ছেলেকে অন্ন জুগিয়ে বড় করে তোলে। তাইতো বড় কন্যাসন্তান বেলা কে বাবুদের বাড়িতে রাখে শুধুমাত্র দুবেলা অন্নজলের বিনিময়ে সারাদিন কাজ করে বেলা। অবশেষে একদিন বেলাকে আউল চাঁদ মামার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ছলে মোহনের ষড়যন্ত্রে

এক বিহারীর কাছে বিক্রি করে দেয়। মাত্র চাঁরশ টাকার লোভ সামলাতে পারেনি আউল চাঁদ। একবারও ভাবেনি একজন সন্তান হারা মায়ের মন কেমন করতে পারে। তাইতো বংশীর দেওয়া খবরে যেন গিরির মাথায় আকাশ ভেঙে পরে,-

> "সর্বনাশ বল সর্বনাশ, ভালো বল ভালো। সংবাদ বড় প্রচন্ড হে মামা! আউল চাঁদ বলেছে – চল বেলা মামার বাড়ি যাবি। তাই বলে মোহনের সাজসে মেয়ে নিয়ে গেছে কান্দি। সেখানে সেই মা চেনা নিনু ভীরু বার বছরের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে ভিন দেশির সঙ্গে। তারা বিদেশি বিহার দেশে থাকে এমন পাঁচটি বেলা রানীকে পাঁচজন বিয়ে করে চলে গেছে দেশে। এসব মেয়ে ব্যাপারি কারবার হে মামা। যে ঠিকানা দিয়ে গেছে সব জাল। এমন কারবার এখন খুব চলছে। আউল চাঁদ কড়করে চাঁরশ টাকা পেয়েছে।"[৯৪]

সমাজে নারীর স্থান যে তৈজস পত্রের মতো পণ্য হয়ে যায় তার যথাযত প্রমান এই গল্প। কেননা এই বেলাবতীর মতো আরও পাঁচজন কন্যার বিবাহ মানে শুধুমাত্র এই পাঁচ জনই নয়। আরও হাজার হাজার জন নারী এভাবেই চরাচালান কারবাড়ির বাঁকে পরে মিলিয়ে গেছে সুস্থ জীবন যাপন পদ্ধতির সীমিত বেড়া জালের গণ্ডি পেড়িয়ে। আউল চাঁদের মতো পিতারও অভাব নেই এই চরাচরে। কেননা প্রতিনিয়ত পত্রিকা সংগ্রহ করলে এমন পিতার সন্ধান হাজার হাজার বেড়িয়ে পরবে। অপরদিকে মোহনের মতো চরাচালান কারবাড়ির দালালেরা তো প্রতিনিয়ত শিকারী বিড়ালের মতো ওৎ পেতে বসে থাকে সুযোগের অপেক্ষায় আর সে কারনেই তো সমাজে বসবাসকারী প্রতিবেশি, বাপ, বাবুর বউ সকলে গিরিকে সান্তনা দেয় এই বলে,

> "কপাল হল সবার উপরে কি করবি বল? মেয়ে যদি তোর কপালে থাকত সে তো ভালোই হত। ছেলে নয়, মেয়ে, মেয়ের নাম ফেলি, যমকে দিলেও গেলি, জামাইকে দিলেও

গেলি। বাবা নিশ্বাস ফেলে বলে, তোর মেয়েটা যেন নিজের জীবন ভাসিয়ে বাপকে ঘর তোলার টাকা দিয়ে গেল।”[৯৫]

সমাজে কন্যা এবং পুত্র একই বাপ মায়ের সন্তান হয়েও মর্যাদার ক্ষেত্রে দুজনের দুরকম স্থান সামাজিক বিধি নিয়মের ক্ষেত্রে। তাইতো ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অধিক পরিমানে বলির পাঠা হতে হয়। মহাশ্বেতাও সে কথাই উল্লেখ করেন, গিরির নিজস্ব জীবনকে বর্ণনা করতে গিয়ে, ‘গিরি দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে থাকে। চোখ বুজে থাকে সে। বড় দু:খে তার মনে সত্যি কথার ঝিলিক জাগে। মেয়ে সন্তানকে নিয়ে অত ভাবতে কেউ রাজী নয়। তারও ভাবা উচিৎ নয়। সেও মেয়ে। তার বাপ তো খোঁজ খবর না নিয়ে এখন অমানুষের হাতেই তাকে দিয়েছিল।’[৯৬]

এটাই স্বাভাবিক পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মেয়ে দের ভাবনা চিন্তা করাটা সময় নষ্ট করা বা এক ধরনের বোকামি ছাড়া কিছু নয়। যদি তা নাই হত তাহলে গিরিও তো ঐ আউল চাঁদের মতো মানুষকে বিয়ে করত না। আসলে মেয়েরা বিয়ে করে না। তাদের বিয়ে হয়। সমাজ দ্বারা, পরিবার দ্বারা, সংস্কৃতির দ্বারা, আর পুরুষরা নিজেরাই বিয়ে করে তাইতো নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন মূল্য ধার্য হয় না। তাই কখনও অভিভাবকের কথায় তো কখনো স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে নারীর জীবনে কলার ভেলার মতো ভেসে যাওয়ারই নামান্তর। কেননা গিরি তার তার ছোট মেয়ে পরিকেও বাবুর বাড়িতে রাখে শুধুমাত্র কাজের বিনিময়ে দুবেলা ভাত কাপড়ে। সেও এক সময় দশ বৎসর বয়সে পৌঁছায় এবং ধারাবাহিক ভাবে বেলার জীবনে যা ঘটে একই পরিনতি হয় পরির জীবনেও। শুধু মাত্র মেয়ে পাচারের মাধ্যমটাকে খানিকটা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কাজ ঐ একই আর সেটা হচ্ছে নারী পাচার। পরিকে বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছে গিরি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সে পুরুষ নয় বলে। কেননা বিয়ের কথা বার্তা মেয়ে ছেলের সঙ্গে হয় না। এই বিরাট চুক্তি পত্রের কাজটা করতে হয় পুরুষে পুরুষে সেখানে নারীর কোন মূল্য নেই। তাই তো ব্যর্থ গিরি স্বাভাবিক ভাবেই পরির বিয়ের পুরো দায়িত্ব তার স্বামী আউল চাঁদের হাতে তুলে দেয়। আর আউল চাঁদ তুলে দেয়

মোহনের হাতে সেই ঠক জোচ্চোর মোহন নারীর দালাল। লেখিকা এই মোহনের ব্যবসার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

> "মোহনেই এই সব ব্যাপারে আউল চাঁদের কান্ডারী। লালবাগ, ধলিযান, জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, ফরাক্কা, কোথায় যায় না সে? দিল্লিতে, মীরাটে, ধানবাদে, টাটায় গনিকা লয়ের ব্যবসা জেঁকে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গের কচি কচি মেয়েদের চাহিদা খুব। বড়লোক ও ব্যবসায়ী খদ্দেররা কচি মেয়ে পছন্দ করে। খাওয়ালে-মাখালে কয়েক বছর বাদেই মেয়েটিকে দিয়ে সব খরচ উশুল করা যায়।"[৯৭]

সমাজে সংস্কৃতিকে নারী পাচার, নারী মাংসের ব্যবসা এভাবেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। উন্নত হচ্ছে চোরা চালান কার বারি ব্যবসার পদ্ধতিরও। মহাশ্বেতা সমাজের এই কদর্যময় জঘন্য ঘৃন্য রূপটিকেই পাঠক মহলকে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু সবই স্বাভাবিক হলেও গিরির মাতৃহৃদয় স্বাভাবিক হয় না। সে তার স্বামীকেও মাপ করতে পারবে না। সমাজকেও দায়ি করতে পারে না। যে মোহন হল পালের গোদা সেও পলাতক। দ্বিতীয় মেয়ে পরির বিবাহের টাকায় আউল চাঁদ কন্যাশোক ভুলে যায়। কিন্তু গিরি ভুলতে পারেনা নিজের জন্ম দেওয়া সন্তানের কথা। কারণ সে বুঝতে পারে বেশ্যারাই বেবুশ্যে মেয়েদের ক্রয় করে এবং তার ব্যবসাকে আরও বড় করে। তাইতো গিরি নিজের বাকি দুটি সন্তানকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যায় শহরের দিকে। সেখানে গিরি ঝি খাটবে, মেয়ে-ছেলেকে বড় করবে তথাপি আর কোন মানুষকে সে বিক্রি হতে দিবে না। কিন্তু সমাজ তাকে কটাক্ষ করতে ছাড়ে না। গিরি ছোট দুটি সন্তানকে নিয়ে চলে গেছে শুনে সমাজের লোকের মতামত মহাশ্বেতা নিজেই তুলে ধরেছেন,-

> "সবাই অবাক হয়ে গেল, মাথা নাড়ল। বেলা আর পরির যা হয়েছে, সে তো এখন ঘরে ঘরে হচ্ছে। তা বলে স্বামী ছেড়ে চলে যায় কে? কোন মেয়ে ছেলে? সবাই নিশ্চিত হল যে

> আউল চাঁদ নয়, গিরিবালা মেয়েটি আসলে মন্দ। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে তবে সবাই কি স্বস্তি যে পেল, তা কি বলি।”[৯৮]

নারীর ক্ষেত্রে সমাজের বিধি উলটপুরানের মতো। পুড়বে নারী উড়বে ছাই – তবে না সমাজ তার গুন গাইবে। কিন্তু এখানে গিরি যে তাঁর ঝলসে যাওয়া বুকে পুরোপুরি পুড়ে যাওয়ার আগেই বিচ্ছেদের জল ছিটিয়ে দগ্ধ ঘা নিয়ে এগিয়ে চলে। এই বিকল্প পথের দাবিদার হবে নারী, এটা সমাজ নিয়ন্তারা মেনে নিবেন কী করে। কর্মশ্রম, যৌন-শ্রম সব দিয়েই নারী যদি তার প্রাপ্য দাবী করে সেটা পুরুষ শাসিত সমাজ মেনে নেয় না। তাই রূপ কানোয়াড়দের বিচার হয় না। যা হয় সেটা একটা প্রহসন। আর এই প্রহসনেই গিরির ‘স্বামী’র মতো কিছু পাশন্ডেরা পঁচে যাওয়া সমাজের সহানুভূতি নিয়ে সমাজকে আরো কলুসিত করার জন্য বেঁচে থাকে।

বস্তুত গিরি বুঝতে পেরেছে সমাজে বসবাস করতে গেলে এইভাবে শুধু মুখ বুজে থাকলে চলবে না। তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তবেই সে তার বাকি দুটি সন্তানকে নিজের মনের মতো করে বড় করতে পারবে। এ সমাজ নারীর জন্য যে পদে পদে বিধি বিধানগুলি নির্মান করে তা লঙ্ঘন করতে না পারলে গিরি আবার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পরতে হতে পারে। তাইতো একই কর্মের জন্য সমাজ তাকে নিন্দা করলেও গিরি কিন্তু অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছে। তাইতো শহরের পথে হাটতে হাটতে গিরি ভাবতে থাকে সেই কথা,

> “.....আগে যদি বুকে এ সাহস জোগাত, তাহলে তো আগেই আমি। তবে কি পরি যায়, বেলা যায়? ভাবতে ভাবতে তার মুখ চোখের জলে ভেসে গেল। তবু সে হেটে চলল।”[৯৯]

হেটে তো যেতেই হবে পথে পথেই যে ইতিহাস রচিত হবে।

তথ্য সূত্র

১. মহাশ্বেতার শ্রেষ্ঠগল্প, সম্পা- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ভূমিকা, পৃ-১০

২. মহাশ্বেতা দেবী, অগ্নিগর্ভ, ভূমিকাংশ, করুনা প্রকাশনি, কলকাতা, পৃ-৯

৩. মহাশ্বেতার শ্রেষ্ঠগল্প, সম্পা- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ভূমিকা, পৃ-১১

৪. মহাশ্বেতার নারীপরিসর ও অন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা,

৫. মহাশ্বেতার শ্রেষ্ঠগল্প, সম্পা- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ভূমিকা, পৃ-১০

৬. মহাশ্বেতার নারীপরিসর ও অন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃ-

৭. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ৯ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, সম্পা- অজয় গুপ্ত, কলকাতা পৃ-৩৯৭

৮. তদেব, পৃ-৩৯৮

৯. তদেব, পৃ-৩৯৮

১০. তদেব, পৃ-৩৯৯

১১. তদেব, পৃ-৪০১

১২. তদেব, পৃ-৪০২

১৩. তদেব, পৃ-৪০২

১৪. তদেব, পৃ-৪০২

১৫. তদেব, পৃ-৪০২

১৬. তদেব, পৃ-৫১৫

১৭. তদেব, পৃ-৫১৮

১৮. তদেব, পৃ-৫১৯

১৯. তদেব, পৃ-৫১৯

২০. তদেব, পৃ-৫২২

২২. তদেব, পৃ-৫২২

২৩. তদেব, পৃ-৫২২

২৪. তদেব, পৃ-৫২৪

২৫. তদেব, পৃ-৫২৩

২৬. তদেব, পৃ-৫২৪

২৭.তদেব, পৃ-৫২৩

২৮. তদেব, পৃ-৫২৪

২৯. তদেব, পৃ-৫২৪

৩০. তদেব, পৃ-৪৩৯

৩১. তদেব, পৃ-৪৩৯-৪৪০

৩২. তদেব, পৃ-৪৪০

৩৩. তদেব, পৃ-৪২৭

৩৪. তদেব, পৃ-৪২৯

৩৫. তদেব, পৃ-৪৩০-৪৩১

৩৬. তদেব, পৃ-৪৩৩

৩৭. তদেব, পৃ-৪৪৩

৩৮. তদেব, পৃ-৪৪৭

৩৯. তদেব, পৃ-৪৭৮

৪০. তদেব, পৃ-৪৭৯

৪১. তদেব, পৃ-৪৭৯

৪২. তদেব, পৃ-৪৭৭

৪৩. তদেব, পৃ-৪৮১

৪৪. তদেব, পৃ-৪৬৪

৪৫. তদেব, পৃ-৪৬৪

৪৬. তদেব, পৃ-৪৬৪

৪৭. তদেব, পৃ-৪৬৭

৪৮. তদেব, পৃ-৪৬৯

৪৯. তদেব, পৃ-৪৭১

৫০. তদেব, পৃ-৪৭১

৫১. তদেব, পৃ-৪৭১

৫২. তদেব, পৃ-৪৭২

৫৩. তদেব, পৃ-৪৭৩

৫৪. তদেব, পৃ-৪৭৫

৫৫. তদেব, পৃ-৪৭৬

৫৬. তদেব, পৃ-৪৭৬

৫৭. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ১০ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, সম্পা- অজয় গুপ্ত, কলকাতা, পৃ-৪১৮

৫৮. তদেব, পৃ-৪১৮

৫৯. তদেব, পৃ-৪২১

৬০. তদেব, পৃ-৪২২-৪২৩

৬১. তদেব, পৃ-৪২৭

৬২. তদেব, পৃ-৪৩৩

৬৩. তদেব, পৃ-৪৩৭

৬৪. তদেব, পৃ-৪৩৬

৬৫. তদেব, পৃ-৪২৭

৬৬. তদেব, পৃ-৪৩০

৬৭. তদেব, পৃ-৪২৯

৬৮. তদেব, পৃ-৪২৯

৬৯. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, সম্পা- অজয় গুপ্ত, খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৩৯

৭০. তদেব, পৃ-৩৪

৭১. তদেব, পৃ-৩৫

৭২. তদেব, পৃ-৩৩

৭৩. তদেব, পৃ-৪৩

৭৪. তদেব, পৃ-৪৫

৭৫. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, সম্পা- অজয় গুপ্ত, ১৪ তম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৩৪৪

৭৬. তদেব, পৃ-৩৪৭

৭৭. তদেব, পৃ-৩৪৯

৭৮. তদেব, পৃ-৩১৯

৭৯. তদেব, পৃ-৩৫০

৮০. তদেব, পৃ-৩৫০

৮১. তদেব, পৃ-৩৫১

৮২.তদেব, পৃ-৩৫২

৮৩. তদেব, পৃ-৩৫৩

৮৪. তদেব, পৃ-৩৫৪

৮৫. তদেব, পৃ-৩৫৬

৮৬. তদেব, পৃ-৩৫৮

৮৭. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ৩য় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, সম্পা- অজয় গুপ্ত, পৃ-৫২৭/৫২৮

৮৮. তদেব, পৃ-৫০৮

৮৯. তদেব, পৃ-৫১১

৯০. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ১০ম খন্ড, সম্পা- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ৪০৮

৯১. তদেব, পৃ-৪০৭/৪০৮

৯২. তদেব, পৃ-৪১২

৯৩. তদেব, পৃ-৪১৭

৯৪. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ১৩ম খন্ড, সম্পা- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৫২২,

৯৫. তদেব, পৃ-৫২৩

৯৬. তদেব, পৃ-৪২৩

৯৭. তদেব, পৃ-৫২৫

৯৮. তদেব, পৃ-৫২৮

৯৯. তদেব, পৃ-৫২৮